বাংলাদেশে ক্ষুধা সূচক ও খাদ্য নিরাপত্তা

ড. আলো ডি'রোজারিও

ভূমিকা

বাংলাদেশে খারাপ খবর যত না প্রচার পায় ভালো খবর তত প্রচার পায় না। ভালো খবর শুনলে যত না সন্দেহ প্রকাশ করি ততটা সন্দেহ প্রকাশ করি না খারাপ খবর শুনে। আমরা কেন এমনটা করি সেই আলোচনা এই লেখার উদ্দেশ্য না। আর এক সময় না হয় তা লেখা যাবে। আমাদের বাংলাদেশের ক্ষুধা সূচক, খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কিছু ভালো-মন্দ খবর ও করণীয়, এইসব এই লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বাংলাদেশের ক্ষুধা সূচক

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বের ১২৫টি দেশের মধ্যে ছিল ৮১তম, আর স্কোর ছিল ১৯। উনিশ স্কোর পাবার কারণে ক্ষুধা সূচকের বিচারে বাংলাদেশ 'মধ্যম পর্যায়ের দেশ'। অর্থাৎ বাংলাদেশের অবস্থান খুব ভালো তা বলা যাবে না, আবার একদম খারাপ সেটা বলাও সঠিক হবে না। একটু পেছনে ফিরলে দেখতে পাবো এই ক্ষুধা সূচকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২৮.৬। অর্থাৎ, তখন অভুক্ত বা অর্ধভুক্ত মানুষের সংখ্যা বেশি ছিল। মনে রাখতে হবে, এই ক্ষুধা সূচকে স্কোর যত কমে খাদ্য প্রাপ্তির অবস্থা তত ভালো হয়, অর্থাৎ ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা কমে। আর এটাও জানা ভালো, বিশ্বে মোট দেশের সংখ্যা ১৯৫টি হলেও তথ্যের অভাবে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ১২৫টি দেশের ক্ষুধা সূচক প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ১১৬টি দেশের ক্ষুধা সূচক প্রকাশ করা হয়েছিল। তখন বাংলাদেশের স্কোর ছিল ১৯.১। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তুলনায় ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থা যৎসামান্য ভালো হয়েছে। ক্ষুধা সূচকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান ছিল বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দেও সেই দুই দেশের অবস্থা বাংলাদেশের চেয়ে খারাপ রয়ে গেছে। আমরা এখন বাংলাদেশে বেশি আলাপ করি না ক্ষুধার্ত বা অভুক্ত জনসংখ্যা নিয়ে। চালের দাম নিয়েও আলাপ কম হয় আজকাল। আমরা বেশি আলাপ করি- পুষ্টিসম্পন্ন খাবার নিয়ে, শিশুর অপুষ্টি নিয়ে, আমিষ তথা মাছ-মাংস ও ডিমের দাম নিয়ে, বেশি করে সবজি ও ফলমূল খাওয়ার সুফল নিয়ে। আমরা একসময় একবেলা পেটপুরে খাবারের চিন্তায় থাকতাম। এখন চিন্তা করি তিনবেলাতেই পেটপুরে খেতে। কেউ কেউ এখন পাঁচবেলা খাচ্ছি। বহু পরিবারে মাছ-মাংস খাওয়া চলছে প্রতিবার ও প্রতিদিন। যেটা একসময় খুব কমসংখ্যক পরিবার পারতো।

বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন

বাংলাদেশে মোটাদাগে তিন ধরনের চাল উৎপাদিত হয়- আউশ, আমন ও বোরো। বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য চাল। বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে চাল উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাধীনতার বছরের সাথে তুলনা করলে বর্তমানে চালের উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন গুণেরও বেশি। বর্তমানে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, যা বিশ্বের মোট উৎপাদনের ৭ শতাংশ। দেশের জনগণের দৈনিক ক্যালরির ৭০ শতাংশের বেশি আসে এই চাল থেকে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার হিসেবে বাংলাদেশ মাথাপিছু বাৎসরিক চাল ভোগে এশিয়ায় দ্বিতীয়, যা প্রায় ১৮০ কেজি। আমাদের মোট জনসংখ্যার জন্যে বছরে যে পরিমাণ চাল দরকার আমরা তা উৎপাদন করতে পারছি। কোনো কোনো বছরে প্রয়োজনের চেয়েও বেশি চাল আমরা উৎপাদন করছি। চাল ছাড়া অন্যান্য কৃষিজ (গম, ডাল, শাক্সবজি, ফলমূল, ইত্যাদি) ও প্রাণীজ (মাছ-মাংস, ডিম, ইত্যাদি) খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। মোট কথা, খাদ্য উৎপাদনে কোনো দুর্যোগবিহীন বছরে আমরা প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল ১৬৯ মিলিয়ন। এর জন্যে মোট খাদ্যশস্য প্রয়োজন ছিল প্রায় ৩২ মিলিয়ন টন। সেই বছরে সব ধরনের খাদ্যশস্য মোট উৎপাদন ছিল ৩৮ মিলিয়ন টন। শুধুমাত্র চালের উৎপাদন সেই বছরে ছিল প্রায় ৩৫ লাখ টন। বাংলাদেশ যদি খাদ্য প্রয়োজনের সবটুকু নিজের দেশেই উৎপন্ন করতে পারে তবে এখানকার জনগণ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে কেন? এই প্রশ্নের জবাব দেবার আগে জানা দরকার আমাদের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বর্তমান অবস্থা।

বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা

'খাদ্য নিরাপত্তা পরিসংখ্যান ২০২৩' শীর্ষক প্রতিবেদনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বিগত বছরের শেষ দিন অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বরে জানিয়েছে, দেশের প্রায় ২২ শতকরা মানুষ বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তার মধ্যে পেশাভিত্তিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষক। খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষকদের মধ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। বঞ্চনা ও বৈষম্যমূলক রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে শহরে এই বঞ্চনার হার প্রায় সাড়ে ১১ শতাংশ। আর গ্রামে এই হার ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ, গ্রামের কৃষকের বঞ্চনার হার শহরবাসীর বঞ্চনার হারের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। একই প্রতিবেদনে দেখা গেছে, বিভাগওয়ারি হিসেবে হাঁওড়-বাঁওড় ও কৃষিজমি বেষ্টিত সিলেট বিভাগের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা সর্বাধিক- প্রায় ২৭ শতকরা। ওপরের এই পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট বুঝে নেয়া যায় যে বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদনকারী কৃষক, কৃষিপ্রধান গ্রাম ও অঞ্চলই আমাদের দেশে সর্বাধিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার। বিষয়টি খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কৃষকরা এত কষ্ট করে খাদ্য উৎপাদন করছে, তারাই সর্বাধিক হারে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার কারণ

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ ক্রয়ক্ষমতার অভাব। ক্রয়ক্ষমতা থাকলে দাম বাড়লেও কমপক্ষে চাল-ডাল-আলু কেনা যায়। মানুষ কখন ক্রয়ক্ষমতা হারায়? যখন তার কর্মসংস্থান থাকে না বা নানাকারণে (বার্ধক্য, অসুস্থতা ও প্রতিবন্ধিতাজনিত শারীরিক অক্ষমতা, ইত্যাদি) কর্মসংস্থান থেকে বাদ

পড়ে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর দুর্ভিক্ষের কারণ বিষয়ক গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত দিয়ে দেখিয়েছেন যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক দুর্ভিক্ষের সময় বাজারে প্রচুর চালসহ অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও ক্রয়ক্ষমতা না থাকাতে অসংখ্য মানুষ না খেয়ে মারা গেছেন। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার দ্বিতীয় প্রধান কারণ অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি- অতিরিক্ত মুনাফালাভের আশায় বেআইনীভাবে খাদ্য মজুদ করে কৃত্রিম সংকট তৈরী ও বাজার নিয়ন্ত্রণ। এটা বাংলাদেশে প্রায়ই ঘটে। শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্যের বেলায় না, অন্য নিত্যপণ্য সামগ্রীর বেলাতেও। বড় আকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগের (বন্যা, খরা, স্লাইকোন, মহামারী, কৃষি জমিতে পোকার আক্রমণ, ইত্যাদি) ও মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট দুর্যোগের (যুদ্ধ, অবরোধ, নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি) কারণেও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা কখনো কখনো কোনো কোনো দেশে দেখা দেয়। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে আমাদের দেশের দুর্ভিক্ষাবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে হয়েছিল। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি, অতিবৃষ্টিজনিত বন্যায় আমন জাতীয় ধানের খেত তলিয়ে যেতে। তাতে সেই বছরে ধানের ফলন হতো না। দেখা দিত সাময়িকভাবে হলেও খাদ্যাভাব। আমাদের এলাকার বহু পরিবার তখন পড়ত খাদ্য নিরপত্তাহীনতায়। বর্তমানে চলমান যুদ্ধের কারণে গাজা এলাকার মানুষজন চরম খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়েছেন। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার আরো বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে খাদ্য অপচয়, পরিবহন ও সংরক্ষণকালীন ঘাটতি ও চুরি, আপদকালীন সময়ের জন্যে সরকারী গুদামে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুদ না থাকা, যুদ্ধ বা পরিবহনজনিত সমস্যার কারণে প্রয়োজনের সময় খাদ্য আমদানী করতে না পারা অন্যতম।

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় গৃহীত উদ্যোগ

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫-ক -তে উল্লেখ করা আছে: 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে... অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা' করা, সেহেতু রাষ্ট্রের পরিচালকগণ সংবিধানে উল্লেখিত অনুচ্ছেদ অনুসারে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাধ্য। তাই, এই মৌলিক অধিকার পূরণে বহুবিধ উদ্যোগ নিয়েছে বিগত ও বর্তমান সরকার। তন্মধ্যে সবচেয়ে আগে উল্লেখ করা যায়, 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী'র কথা যে কর্মসূচীর আওতায় সারাদেশের ৫০ লাখ দরিদ্র পরিবারকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল ১০ টাকা দরে দেয়া হচ্ছে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে 'শেখ হাসিনার বাংলাদেশ, ক্ষুধা হবে নিরুদ্দেশ'- এই শ্লোগান সামনে রেখে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী চালু করে সরকার। প্রতিবছর মার্চ থেকে মে এবং সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর, মোট সাত মাস এই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়। এই প্রকল্পটি ছাড়াও সরকারের আরো অনেক প্রকল্প আছে যেইসব প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে ক্রয়ক্ষমতা ধরে রাখা, পিছিয়ে পড়া ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ ও খাদ্যপুষ্টির নিশ্চিতের বিষয় গভীর মনোযোগের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই ধরনের প্রকল্পসমূহের সাধারণ নাম 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প' আর এইসব প্রকল্প বাবদ বাংলাদেশ সরকার বর্তমান অর্থবছরে (২০২৩-২৪) বাজেট রেখেছে ১ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরে (২০২২-২৩) বরাদ্দ রাখা হয়েছিল- প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার কোটি টাকা। গত অর্থবছরের চেয়ে বর্তমান অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ বেড়েছে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা। 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচী' ও 'সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প' বিষয়ক সব তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের (অর্থ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ও ত্রাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য ১১টি মন্ত্রণালয়) ওয়েবসাইটে দেয়া আছে। বিভাগ ও জেলাওয়ারী হিসেবসহ উপজেলা পর্যায়ের বরাদ্দের পরিমাণ, উপকারভোগীর সংখ্যা, নীতিমালা ও নিয়মাবলী সংগ্রহ করা একটু উদ্যোগ নিলেই সম্ভব।

উপসংহার

সরকারের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমরা আমাদের প্রতিটি ইঞ্চি জমি নিজ উদ্যোগে বা অন্যের মাধ্যমে সর্বোত্তম ব্যবহার করে আরো বেশি খাদ্য, শাক-সবজি, ফল-মূল উৎপন্ন করতে পারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই আহ্বান আমাদের সকলের প্রতি রেখেছেন এবং তিনি নিজে তা-ই করছেন। আমরা খাদ্য পরিমিত ব্যবহারে অধিক যত্নবান হতে পারি। খাদ্য অপচয় রোধে রান্নাকরা ভালো খাবার সময়মতো যাদের আর্থিক অসুবিধায় খাবার পেতে কষ্ট হয় তাদের মধ্যে বিতরণ করতে পারি। মহামান্য পোপের আহ্বানে ভাটিকানে তা করা হয়। সেখানে বিভিন্ন অতিথিশালা, ফাদার ও সিস্টারদের বাড়িতে রাত আটটা কি সাড়ে আটটার মধ্যে রাতের খাবার শেষ হলে উদ্বৃত্ত খাবার পৌঁছে দেয়া হয় একটি সিস্টার বাড়িতে। সেই বাড়ির সিস্টারগণ সেসব খাবার যত্নসহকারে প্যাকেট করে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে আশ্রয়গ্রহণকারীদের মধ্যে বিতরণ করেন। আমরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধিপূর্বক আরো অধিক সংখ্যক দুঃস্থ ও অভাবী পরিবারকে সরকারী প্রকল্পের উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তিতে সহায়তা করতে পারি। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বাঁধা হিসেবে আসবে বিধায় পিছিয়ে আসলে চলবে না। সাহস নিয়ে নাছোড়বান্দার মতো খাদ্যে জনগণের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে লেগে থাকতে হবে। সরকারী সুবিধাদি পাবার ক্ষেত্রে সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে সোচ্চার হতে হবে, সংঘবদ্ধ হতে হবে। খাদ্যের দাবী আদায় করে নিতে সহৃদয় ও বিবেকবান ব্যক্তিসহ মানবিক সহায়তাদানকারী বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তা নিতে হবে॥ ❑

লেখক: প্রেসিডেন্ট, কারিতাস এশিয়া
প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক,
কারিতাস বাংলাদেশ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর নিয়মিত লেখক

খ্রিস্টের পুনরুত্থান

বাতিস্তা এনসন হেমব্রম

যিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন
তিনি আমাদের পাপ থেকে বাঁচিয়েছেন।
আমরা বিশ্বাসীরা মৃত্যুকে পাই না ভয়
যিশু করেছেন মৃত্যুকে জয়।
যত পাপ ধুয়ে যায় ক্রুশের তলে
যিশুর রক্তে ডুব দিলে মুক্তি মিলে
ধন্য মোরা ধন্য
প্রভু যিশুকে মুক্তিদাতা
হিসেবে পাওয়ার জন্য।
খ্রিস্টীয় জীবনে পুনরুত্থান আনন্দের বিষয়
এতে যিশুর গৌরব প্রকাশিত হয়
মৃত্যু থেকে যিশু পুনরুত্থিত হলেন,
পাপীর জন্য স্বর্গ দুয়ার খুলে দিলেন
পাপী তাপী যত ছিল
যিশুর নামে উদ্ধার পেল
ধন্য হলো এই জীবন
যিশু দিলেন নতুন জীবন॥

২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী

হিউবার্ট ফ্রান্সিস সরকার

জন্ম : ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ এপ্রিল, ১৯৯৫ (পুণ্য শনিবার)
পিতা : প্রয়াত জেরোম সরকার
মাতা : প্রয়াত মারীয়া সরকার
লক্ষীবাজার ধর্মপল্লী, ঢাকা।

The Prayer I say the Every Other day

By Hubert Francis Sarkar

Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong
Where in deep silence I may make my deep-breathed utterances
Where my feelings grow evermore strong
Whilst my alter-ego's disparate gaze, forage and embrace most
wistfully I long.
Yes, Sir I long for her opulent smile,
The smile without any trace of guile.
Yes, I cherish to be detained in her little prison,
The little prison where in cordial detainment
I can read my own profile.
Sir, you call us all to your own grotesque colosseum.
In great befuddlement, we rather are stuck in the marathon
business of a workaholic an idler.
We fail to aspire to obviate the thrust-on mandate, fairness and decorum.
Just bustling with trifle details, our time hums.
Sir, the prayer I say the every other day is simply this one
whereby I try to reach my un-spectacular world,
my divine arbiter, my own Joan.
Please, my dear Taskmaster, pull me wholly to where I belong.
Here, with a thousand others I try to touch your sampan.

(প্রকাশনা: ম্যাগাজিন সেকশন, দ্য ডেইলী ষ্টার, নভেম্বর ২৭, ১৯৯২)

সকল কল্যাণকামী মানুষের কাছে আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মার মঙ্গল ও চির শান্তি কামনা করে প্রার্থনার অনুরোধ জানাচ্ছি। ঈশ্বর সকলের মঙ্গল করুন। আমাদের ভাই/কাকু/মামার আত্মা চির শান্তি লাভ করুক।
জন (বড়ভাই) + বেবী (বৌদি) : মারীয়া, হিউবার্ট ও টিমথি
ফিলিপ (মেঝভাই) + জয়া (বৌদি) : এলেন ও এঞ্জেলা
মালা (বোন) + মিঠু (ভগ্নিপতি) : আর্থার।

বিজ্ঞ/৬৬/২৪

ডিভাইন মার্সি হাসপাতাল

Love Care Compassion

09678777895

৩০০ শয্যাবিশিষ্ট সর্বাধুনিক হাসপাতাল

বাংলাদেশে সমবায়ীদের প্রথম হাসপাতাল

মঠবাড়ী, উলুখোলা, নাগরী, কালীগঞ্জ, গাজীপুর, বাংলাদেশ

আমাদের সেবাসমূহ:

- ২৪ ঘন্টা জরুরী সেবা
- ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সুবিধা
- সর্বাধুনিক ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি
- ১২৮ স্লাইস সিমেন্স সিটি স্ক্যান
- ইসিজি (ECG), ইকো (ECHO), ইটিটি (ETT), আল্ট্রাসনোগ্রাম (USG), ডিজিটাল এক্স-রে
- ডায়ালাইসিস সেন্টার
- ফিজিওথেরাপি বিভাগ
- ২৪ ঘন্টা ফার্মেসী সেবা
- মেডিসিন, কার্ডিওলজি, লিভার ও গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, নেফ্রোলজি, চর্ম ও যৌন, নবজাতক ও শিশু, অবস্ ও গাইনি, সার্জারি, ইউরোলজি, ইএনটি, অর্থোপেডিক্স ও ট্রমা, চক্ষু, ডেন্টাল
- আইসিইউ (ICU) • এইচডিইউ (HDU)
- সিসিইউ (CCU) • পিআইসিইউ (PICU)
- এনআইসিইউ (NICU)

৩১ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রী: আশীর্বাদ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ডিভাইন মার্সি হাসপাতালের সকল সেবা কার্যক্রম শুরু হয়েছে

সেবা নিন-সুস্থ থাকুন

www.divinemercyhospital.com info@divinemercyhospital.com

A Concern of DHAKA CREDIT

বিজ্ঞ/৭৮/২৪

চিরনিদ্রায় এডওয়ার্ড কোড়ায়া

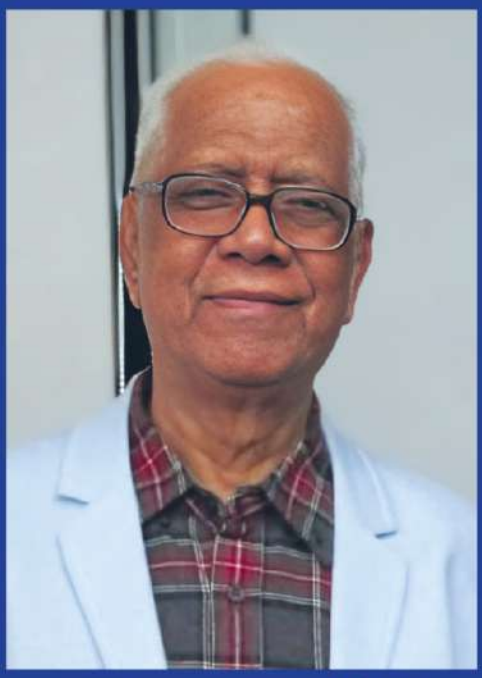

জন্ম: ২৮ মে, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে, বিগত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে, মিঃ এডওয়ার্ড কোড়ায়া, পাড়ি জমিয়েছেন, পরম পিতার অনন্তধামে। তিনি ঢাকা জেলার তুইতাল ধর্মপল্লীর, পুরান তুইতাল গ্রামের স্বর্গীয় জন লালু কোড়ায়া এবং স্বর্গীয়া ইজাবেলা কোড়ায়ার কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁর বড় বোন স্বর্গীয়া এডলিনা ডি'রোজারিও এবং বড় ভাই স্বর্গীয় ডানিয়েল কোড়ায়া। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। লেখাপড়া শেষ করে তিনি দীর্ঘদিন **Glaxo Pharmaceutical Limited Co.** তে কর্মরত ছিলেন এবং সেখান থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ কেন্দ্র প্রতিবেশীতে প্রশাসক পদে ৫বছর কাজ করেছেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি পরিবার পরিজনসহ কাটিয়েছেন, ঢাকার লক্ষীবাজার ধর্মপল্লীতে। জীবন সায়াহ্নের ১৭টি বছর তিনি কাটিয়েছেন, তেজগাঁও ধর্মপল্লীর তেজকুনিপাড়ার নিজ বাসস্থানে। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে, তাঁর পাশে উপস্থিত ছিল তাঁর ভালোবাসার এবং আদরের মানুষগুলো। বিশ্বাস করি তাঁর সততা, অমায়িক ব্যবহার এবং সহজ সরল জীবনযাপনের পুরস্কার, ঈশ্বর তাকে দান করবেন। ঈশ্বরের রাজ্যে হবে তার নতুন আবাসন।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে,
সহধর্মিণী প্রিসকা পুষ্প কোড়ায়া এবং সন্তানেরা ও তাদের পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/৬৫/২৪

দশম মৃতুবার্ষিকী

প্রয়াত সিলভেস্টার গমেজ

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

গোপাল মাদ্বর বাড়ি
গ্রাম: নতুন তুইতাল
থানা: নবাবগঞ্জ
জেলা: ঢাকা।

প্রিয় পাপা/দাদা/নানু,

ব্যস্ত পৃথিবীতে সময়টা খুব দ্রুত চলে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে ১০ বছর পেরিয়ে গেল, তুমি আমাদের মাঝে নেই। কোথায় যেন একটা শূন্যতা সব সময়ই অনুভব করি। তুমি কাছে থাকলে জীবন চলার পথটা হয়তো আরো সহজ হতো। তোমার কথা সময় সময় শুনিনি বলে তুমি কখনো কখনো রাগও করতে। তারপরও মনে হয় মাঝে মাঝে কিছু বিষয়, কিছু সিদ্ধান্ত তোমায় জানানোর খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

আমরা বিশ্বাস করি, তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের সর্বদা আশীর্বাদ করছো, যেন আমরা সঠিক পথে চলতে পারি। আমরা তোমার জন্য প্রার্থনা করি তুমি যেন চির শান্তিতে থাকতে পার। তোমার পাওয়ার বা দেওয়ার কিছু না থাকলেও আমাদের চোখে চোখে রেখ, এই কামনা করি।

"You were like sunrays,
every morning I wished
to have your rays to start my every day!
They say.....
I was the son of my dad,
I was so because of my dad
who corrected, guided, protected me
every second, every moment, every day- like sunrays!
Now, I take your memories
your attitude and
your selflessness to walk my way!
I'm sad that you're no more here,
but deep down I know
you're still protecting, guiding
and cheering my every step,
every second, every moment, everyday- like sunrays"

শোকাহত -

স্ত্রী: মনিকা গমেজ
বড় মেয়ে ও পরিবার: লিলি, প্রভাত, ব্লেস
ছোট মেয়ে ও পরিবার: বেবী, জন, গ্রেস, তীর্থ ও অর্ঘ্য
বড় ছেলে ও পরিবার: ডঃ জেম্‌স, উপাসনা, ফ্র্যাঙ্কলিন
ছোট ছেলে ও পরিবার: রিচার্ড, সন্ধ্যা, ধ্রুব, সৃষ্টি

বিজ্ঞ/৬৭/২৪

কাথলিক বিবাহ ও বর্তমান বাস্তবতা

এলয়সিয়াস মিলন খান

ভূমিকা: কাথলিক বিবাহ একটি অবিচ্ছেদ্য পবিত্র বন্ধন। একজন নারী ও একজন পুরুষ স্বইচ্ছায় পরস্পরকে ভালোবেসে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে সংসার জীবনে প্রবেশ করেন। কাথলিক ধর্মমতে একজন যাজকের উপস্থিতিতে ঈশ্বরকে স্বাক্ষী রেখে বিবাহ মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে আজীবন স্বামী-স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেন। এ বন্ধন চিরন্তন ও অবিচ্ছেদ্য। শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্করাই এই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্য।

দাম্পত্য জীবনের মূল স্তম্ভ: এ দাম্পত্য জীবনের মূল স্তম্ভ হলো - ভালেবাসা, বিশ্বস্ততা, আত্মত্যাগ, বিশ্বাস-আস্থা ও দায়িত্বশীলতা। স্বয়ং ঈশ্বরই ভালোবাসার উৎস। তাই ভালোবাসা ঈশ্বরনির্গত। এ ভালোবাসায় কোন ছল-চাতুরীর স্থান নেই। নেই কোন অস্বচ্ছতা, কোন মিথ্যাচার। এ ভালোবাসা সর্বদা পরস্পরের মঙ্গল কামনায় মগ্ন থাকে। তাই কাথলিক বিবাহ মন্ত্রে আমরা যে বিশ্বাস মন্ত্র উচ্চারণ করি তা হলো: সুখে-দুঃখে, স্বাস্থ্যে-অস্বাস্থ্যে, ধনে-দারিদ্র্যে একে অপরকে আজীবন রক্ষা করা ও ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা করা। সংসার জীবনে প্রবেশ করে আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করি। সংসার জীবন হলো ত্যাগের জীবন, ভালোবাসার জীবন।

সাধু পৌল করিন্থীয়দের প্রতি তাঁর পত্রে বলেছেন, "ভালোবাসা সহিষ্ণু, মধুর ভালোবাসা; ভালোবাসা ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না। গর্বে স্ফীত হয় না, রুক্ষ হয় না, স্বার্থপর নয়, বদমেজাজী নয়, পরের অপরাধ ধরে না। অধর্মে আনন্দ পায় না, বরং সত্যকে নিয়েই তার আনন্দ; ভালোবাসা সবই ক্ষমা করে, সবই বিশ্বাস করে, সবই আশা করে। সবই ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে। ভালোবাসা কখনই শেষ হবে না (করিন্থীয় ১৩: ১-৮)।

বিবাহ-বিচ্ছেদ: কাথলিক বিবাহ এক ও অবিচ্ছেদ্য। এর বিচ্ছেদ ঘটনার কারো কোন অধিকার নেই। তৃতীয় পক্ষের তো অবশ্যই নয়, স্বামী-স্ত্রীরও এতে কোন অধিকার নেই। কারণ তারা নিজেরাই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, স্ব-জ্ঞানে স্বাধীনভাবে এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই অবিচ্ছেদ্য বন্ধন টিকিয়ে রাখার সমস্যা হলেও মিলন-পুনর্মিলনের প্রতিকার বৈবাহিক প্রতিশ্রুতিরই পূর্বশর্ত। তাই কাথলিক স্বামী-স্ত্রীর কখনোই বিবাহের প্রতিজ্ঞা এবং বিবাহের পবিত্র অবিচ্ছেদ্য বন্ধন ভুলে যাওয়া উচিৎ নয়। দাম্পত্য সমস্যার সমাধান হিসেবে পুনর্মিলনের বাইরে অন্য কোন বিকল্প চিন্তা করা উচিৎ নয়। যদি বিবাহ-বিচ্ছেদ অভিসম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায় তবে ভাবতে হবে সেই বিবাহের শুরুতেই গলদ ছিল। তাদের মধ্যে প্রকৃত ভালোবাসার অভাব ছিল। কোন মোহের বশবর্তী হয়ে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। তারা একে অপরকে প্রতারণা করেছেন। ভালোবাসার অভিনয় করে তারা নিজেদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছেন। প্রতারণা করে যে-বিবাহ সংঘটিত হয় সে-বিয়ে তো আসলে বিয়ে নয়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যিনি মানুষের মনবাঞ্ছা জানেন তিনি তো কোন মিথা প্রবঞ্চনা সমর্থন করতে পারেন না। সুতরাং এ ধরনের লোক দেখানো বিয়েকে তো ঈশ্বর কোনদিন যুক্ত করতে পারেন না।

পবিত্র বাইবেলে বেন-সিরা গ্রন্থের ২৬ অধ্যায় উল্লেখ আছে "যার বধূ পুণ্যবতী, সেই মানুষ, আহা, কেমন সুখী! দ্বিগুণ হবে তার আয়ুষ্কাল। উত্তম বধূ তার নিজের স্বামীর সুখ, তার স্বামী শান্তিতেই জীবনযাপন করবে। গুণবতী বধূ উত্তম সম্পদ, তাকে তাদেরই জন্য বন্টন করা হয় যারা প্রভুতে ভয় করে। সেই স্বামী ধনী হোক কি নির্ধন হোক, তার হৃদয় আনন্দিত হবে, যে কোন সময় উৎফুল্ল হবে তার সুখ।"

বর্তমান বাস্তবতা: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক পেক্ষাপট ও নানাবিধ বৈশ্বিক কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দিনে দিনে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিবাহ-বিচ্ছেদের সবচেয়ে বড় কারণ বিবাহবহির্ভূত সর্ম্পক এবং দাম্পত্য জীবন পালনে অক্ষমতা, বনিবনার অভাব।

বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরোর এক জরিপ প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মে ও সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পাছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসেবে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ২২.৬%, দাম্পত্য জীবন পালনে অক্ষমতা ২২.১%, ভরণ পোষনে অক্ষমতা ১০.৬%, পারিবারিক চাপ ১০.২%, শারীরিক নির্যাতন ৯.৮%, পুনরায় বিয়ে ৪.১%, অক্ষমতা/যৌনতায় অনিহা ৩.৮%, অনান্য ১৬.৮%। জরিপ প্রতিবেদনে আরো দেখা যায়, সারা দেশে বিয়ের হার বেড়েছে। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাধারণ বিয়ের হারের গতিধারা এক বছরের ব্যবধানে অনেকটা বেড়েছে। ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ বিয়ের হার পাওয়া গেছে ২৫-এর কিছু বেশি। ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সী প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে যত জনের বিয়ে হয়েছে, সেটা সাধারণ বিয়ের হার। এই হার ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ছিল ১৮.৫%। সাধারণ বিয়ের হারে নারী পুরুষের মধ্যে তেমন পার্থক্য নেই। তবে ধর্মভেদে তারতম্য দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যে হারটি বেশি, ২৬%। অন্য দিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তা ১৮% এর কিছু বেশি। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে সাধারণ বিয়ের হার ১৫% এর মতো । জরিপে নারী ও পুরুষেরা প্রথম বিয়ে কত বছর বয়সে করেছেন তার একটি গড় হিসাব উঠে

এসেছে। বিবিএস বলছে, পুরুষের বিয়ের গড় বয়স ছিল ২৪ বছর। নারীর ক্ষেত্রে তা ১৮.৪ বছর।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আলাদা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ দাম্পত্য জীবন বজায় রাখতে অক্ষমতা ও শারিরীক নির্যাতন। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদের বা আলাদা হওয়ার কারণসমূহের কোন সমিক্ষা আমার জানা নেই। তবে খ্রিস্টান ধর্মমতে বিবাহের সংস্কারীয় মূলবোধের অবিশ্বস্ততা, দাম্পত্য ভালোবাসার নিঃস্বার্থ আত্মদানের অবহেলা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ত্যাগ ও ক্ষমা দানে অনিহা দাম্পত্য সমস্যার মূল কারণ বলে মনে করা হয়। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক কলহ, অর্থনৈতিক সমস্যা, পরকীয়া সম্পর্ক, দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাদা বসবাস যেমন চাকরির ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে দীর্ঘদিন অবস্থান ইত্যাদি। যে সমস্ত পরিবার উন্নত জীবন-যাপনের প্রত্যাশায় বিদেশে যায় যেমন: ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ইত্যাদি দেশে পাড়ি জমিয়েছে সে-সমস্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবত: নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতি তাদের মধ্যে মানসিক পরিবর্তনের কারণে। বিশেষ করে যে-সমস্ত দম্পতি দাম্পত্য জীবনে সুখী ছিলেন না কিন্তু পারিবারিক কারণে বর্তমান অবস্থা মেনে নিয়ে একত্রে বসবাস করছিলেন। পারিপার্শ্বিক কারণে, বর্তমান অবস্থা মেনে নিয়ে একত্রে বসবাস করছিলেন।

মিশ্র বিবাহ: কাথলিক মণ্ডলীতে মিশ্রবিবাহ হলো এমন এক ধরনের বিবাহ সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজন কাথলিক আর অন্যজন অকাথলিক বা অন্য ধর্মাবলম্বী। বাংলাদেশের পটভূমিতে কাথলিক ছেলে-মেয়েরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং চাকুরি বা কর্মস্থলে অকাথলিক বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সান্নিধ্যে আসে। এতে সাধারণ নারী পুরুষ হিসেবে তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বন্ধুত্ব, ভালোবাসা গড়ে উঠতেই পারে। এই সম্পর্ক যখন গভীর আকার ধারণ করে তখন তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবেই মিশ্র বিবাহের সূচনা হয়। মিশ্রবিবাহ কোন অন্যায্য বন্ধন নয়। তাই কাথলিক মণ্ডলী কিছু শর্ত সাপেক্ষে মিশ্র বিবাহ অনুমোদন করে। এ ক্ষেত্রে তাদের সন্তানদের অবশ্যই কাথলিক ধর্ম গ্রহণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

উপসংহার: বর্তমান বিশ্বে বিবাহ নিয়ে নানা মতবাদ রয়েছে। কিছু কিছু দেশে একই লিঙ্গে বিবাহ অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে কাথলিক মণ্ডলী চিন্তিত। মণ্ডলীর শিক্ষা অনুসারে বিবাহ নারী-পুরুষের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য পবিত্র বন্ধন। যে-সমস্ত দম্পতি নানাবিধ যুক্তিসঙ্গত কারণে আর একত্রে বসবাস করতে পারছেন না তাদের সমাজ ও মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে আলাদাভাবে বসবাসের অনুমোদন প্রদান করা যেতে পারে। কারণ একজন মানুষের সুখে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার তার মানবাধিকার। আসুন আমরা আমাদের এই অবিচ্ছেদ্য পবিত্র বিবাহ বন্ধন অটুট রেখে সুখী সমৃদ্ধ সংসার জীবন যাপন করতে সর্বদা সচেষ্ট হই এবং আমাদের জীবন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ঐশরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করি।

তথসূত্র:

১. দৈনিক প্রথম আলোঃ বাংলাদেশে বিয়ে ও তালাক, তারিখ ৮/২/২০২৪ খ্রিঃ

২. বিবাহ ও দাম্পত্য জীবন, আমাদের জীবনে জ্বালাও প্রেমের শিখা, ড. ফাদার মিন্টু এল, পালমা

৩.প্রতিবেশী প্রকাশনী॥ ❑

লেখক: সমবায়ী ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার প্রাক্তন কর্মকর্তা

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত **"মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রজেক্ট (MTTP)"** এর ৬ (ছয়) মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ট্রেডে আগামী এপ্রিল ২০২৪ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরিভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি হতে এস.এস.সি (খ) বয়সসীমা : ছেলে/পুরুষ: ১৬-২২ বছর, মেয়ে/ নারী: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/ তালাকপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), (গ) বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত/ অবিবাহিত (ঘ) পারিবারিক অবস্থা : অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা (ঙ) অগ্রাধিকার : কারিতাস সহযোগী দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলেমেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য

যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক হাউজ ওয়্যারিং এন্ড মটর রিওয়্যান্ডিং (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড স্টিল ফেব্রিকেশন (ঘ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশন (চ) টেইলারিং এন্ড ইন্ড্রাসট্রিয়াল সুইং (ছ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারি (জ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটেনিং (ঝ) বিউটিফিকেশন
কোর্সের মেয়াদ: ৩ মাস ও ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, অনাবাসিক, ভর্তি ফি ১০০/- (একশত) টাকা, মাসিক টিউশন ফি ৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা (অঞ্চল অনুসারে কম/বেশী হতে পারে)।	

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড ছেলে/ মেয়ে / পুরুষ/ নারী জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী ও যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে;

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি/; (ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান; (চ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া; (ছ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া।

৫। এলাকাভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগোযোগের ঠিকানা

মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের **ক্ষেত্রে যোগাযোগের ঠিকানা**

টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল -৮২০০ ফোন: ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা স্ট্যান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন: ০১৭১৩২৫৭২৬০	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০ ফোন: ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি, ১/ডি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬ ফোন:০১৯৫৫৫৯০৬৫৫
অধ্যক্ষ ব্রাদার ফ্রেভিয়ান টেকনিক্যাল স্কুল শাহ মিরপুর, কর্ণফুলী চট্টগ্রাম ফোন: ০১৭১৩৩৮৪১০৩	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ ২২০০, ফোন: ০১৬২৫১১৩১৭৫	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর, ফোন: ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	ইনচার্জ, সিটিএসপি কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২, আউটার সার্কুলার রোড শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭ ফোন: +৮৮ ০২ ৪৮৩১৫৪০৬-৯

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

কাথলিক চার্চের জ্ঞানের প্রাচুর্য: ভাটিকান লাইব্রেরি

জয় চার্লস রোজারিও

ভাটিকান লাইব্রেরি (The Vatican Apostolic Library) হল এই আধুনিক পৃথিবীর অমূল্য ধনসম্পদ; অর্থাৎ জ্ঞান এবং কাথলিক চার্চের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক প্রাচুর্যের প্রতীক। ভাটিকান লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত বিভিন্ন প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে দুর্লভ বই, পুরানো মুদ্রা, বিভিন্ন শিল্পকর্ম ঐতিহাসিক রোম শহরের বহু শতাব্দী ধরে সঞ্চিত বিপুল জ্ঞানের আভাস দেয়।

ভাটিকান অ্যাপোস্টোলিক লাইব্রেরি, যার ল্যাটিন নাম Bibliotheca Apostolica Vaticana এবং ইতালীয় নাম Biblioteca Apostolica Vaticana; ভাটিকান লাইব্রেরি নামেই বেশি পরিচিত। এর অবস্থান ভাটিকান সিটিতে এবং এটি রাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার। এই লাইব্রেরি ১৫ শতকে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হয়েছিল। ১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৫ম নিকোলাস প্রথম এই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ৪র্থ সিক্সটাস আনুষ্ঠানিকভাবে পাবলিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভাটিকান লাইব্রেরিকে ঘোষণা করেন এবং পণ্ডিতদের গবেষণা কাজে এই লাইব্রেরির বিশাল জ্ঞান-সম্পদগুলি ব্যবহারের অনুমতি দেন।

বিশ্বের প্রাচীনতম লাইব্রেরিগুলির মধ্যে ভাটিকান লাইব্রেরি একটি এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংগ্রহ এই লাইব্রেরিতে রয়েছে। এর সংগ্রহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রায় ৭৫,০০০ কোডিস [কোডিস হলো বইয়ের আদি রূপ বা হাতে লেখা পুঁথি অথবা পাণ্ডুলিপি]। পাশাপাশি ষোলো লক্ষাধিক মুদ্রিত বই রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৮,৫০০টি ইনকুনাবুলা [১৫০০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে ছাপানো বই আকারের বস্তুকে বলে ইনকুনাবুলা] রয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গ্রন্থাগারের নিজস্ব সংগ্রহ, অনুদান ও উপহারের মাধ্যমে পাওয়া এবং পোপের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এই লাইব্রেরির সংগ্রহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচীন পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি মুদ্রিত বইগুলিও সংগ্রহ করা শুরু হয়ে যায়, যার মধ্যে কয়েকটি দুই হাজার বছরেরও বেশি পুরানো। মুদ্রণযন্ত্রের আবির্ভাবের সাথে সাথে গ্রন্থাগারটির সংগ্রহও দ্রুত প্রসারিত হয়।

১৫২৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ৫ম চার্লস ও আরো কয়েকটি রাজ্যের রাজারা যখন যৌথ অভিযান চালিয়েছিল, তখন এই ভাটিকান লাইব্রেরি ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। পরবর্তীতে নেপোলিয়নিক যুদ্ধের মতো চ্যালেঞ্জ এবং সংকটের সম্মুখীনও হতে হয়েছে এই লাইব্রেরিকে। যার ফলে অনেক পাণ্ডুলিপি এবং বই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ভাটিকান লাইব্রেরি তার সংগ্রহ পুনরুদ্ধার এবং প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিল। আজ এটি পণ্ডিত, গবেষক এবং শিক্ষাবিদদের জন্য একটি অপরিহার্য সম্পদ হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।

ভাটিকান লাইব্রেরিতে বিভিন্ন সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক সময়কালের ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে রয়েছে কোডেক্স ভাটিক্যানাস [Codex Vaticanus Graecus 1209], কোডেক্স ভাটিক্যানাস হলো গ্রীক বাইবেলের প্রাচীনতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কপিগুলির মধ্যে একটি। উল্লেখযোগ্য আরো দুইটি সংগ্রহ হলো ভাটিকান ভার্জিল [Virgilius Vaticanus, ৫ম শতাব্দীর প্রথম কবি ভার্জিলের রচনাগুলির একটি সুন্দর চিত্রিত পাণ্ডুলিপি]; এবং দান্তের ডিভাইন কমেডির [Devine Comedy] একটি চিত্রিত কপি। এমনি বহু প্রচীন ও অনন্য সংগ্রহের এক বিশাল সমারোহ এই ভাটিকান লাইব্রেরি।

লাইব্রেরিটিতে প্রাচীন মানচিত্র এবং গ্লোবের একটি বিশাল সংগ্রহও রয়েছে। যেমন গ্যালারি অফ ম্যাপস, যেখানে ১৬ শতকের বিভিন্ন ইতালীয় মানচিত্র স্থান পেয়েছে। এগুলো ফ্রেস্কো অর্থাৎ দেয়াল চিত্র হিসেবে সংরক্ষিত আছে। উপরন্তু, এটি দেয়ালচিত্র, ভাস্কর্য এবং পেইন্টিংসহ অসংখ্য শিল্পকর্মের সাথে মুদ্রা এবং পদকের একটি ধারাবাহিক সংগ্রহশালা বলা যায়।

এখানে উল্লেখযোগ্য আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ সামগ্রী হলো প্রাচীন কিছু মুদ্রা। এই মুদ্রা যে সেই মুদ্রা না। এই মুদ্রাগুলো ছিল বিশ্বাসঘাতক যুদাসের, যা কিনা সে যিশুকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে পেয়েছিল। যদিও এই মুদ্রাগুলোর বিষয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের মধ্যে মতবিরোধ ও ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, ভাটিকান লাইব্রেরি পর্যটক এবং দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত নয়। শুধুমাত্র পণ্ডিত, গবেষক, ইতিহাসবিদ এবং শিক্ষাবিদ যাদের পেশাগত কাজের জন্য লাইব্রেরির সংগ্রহসমূহ ব্যবহার করা প্রয়োজন, শুধু তাদেরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে।

ভাটিকান লাইব্রেরিতে পর্যটকদের প্রবেশাধিকার না থাকার অন্যতম প্রধান কারণ হল লাইব্রেরির সংগ্রহগুলোকে যথাযথভাবে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করা। লাইব্রেরির মধ্যে থাকা আইটেমগুলি অতি বিরল, মূল্যবান এবং বয়সের ভারে দুর্বল। এখানে অবাধ বিচরণের অনুমতি দেওয়া হলে তা এই মূল্যবান পাণ্ডুলিপি, বই এবং শিল্পকর্মগুলিকে বিপদে ফেলতে পারে, যার ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। নিরাপত্তার বিষয়টি আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের কারণ। ভাটিকান লাইব্রেরিতে অমূল্য নিদর্শনগুলির একটি বিস্তৃত সংগ্রহ রয়েছে। কেউ যেন কোনো বই বা পাণ্ডুলিপি লাইব্রেরি থেকে সরিয়ে নিতে বা নষ্ট করতে না পারে - তাই এর উন্মুক্ত ব্যবহারে এত কড়াকড়ি।

ভাটিকান লাইব্রেরি কাথলিক চার্চের ইতিহাসের এক জীবন্ত সংগ্রহশালা রূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই লাইব্রেরির ভিতরে রয়েছে অতুলনীয় এবং অনন্য ইতিহাস ভাণ্ডার। শুনলেও মনে লোভ জাগে, অন্তত একটিবার এই লাইব্রেরিটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য যদি হতো! ❑

লেখক: সহকারী গ্রন্থকারিক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুবজীবনে পুনরুত্থান

ফাদার বিকাশ কুজুর সিএসসি

বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়তই দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। যুগের সাথে সাথে বদলে যাচ্ছে মানুষের মন-মানসিকতা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, প্রকাশভঙ্গি, নৈতিকতার মানদণ্ড এবং আরও অনেক কিছুই। বস্তুত আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। ফলে আমাদের চারপাশে বহুমুখী পরিবর্তন লক্ষণীয়। এ পরিবর্তনশীলতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলতে না পারলে, নিশ্চিতভাবে পিছিয়ে পড়তে হবে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে বিভিন্নমুখী সমস্যা ও সংকটও তৈরি হচ্ছে। তাই এক্ষেত্রে যুব সমাজকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কেননা তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে ইন্টারনেটের বহুল ব্যবহার এবং প্রাত্যহিক জীবনে এর বহুল প্রয়োগ তাদের জীবনকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। তাই তারা যদি এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে সতর্ক না থাকে, তবে তারা বিপদে পড়তে পারে; তাদের জীবনে পতন নেমে আসতে পারে।

বর্তমান যুব সমাজের কাছে ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো নিত্যদিনের খাদ্য তালিকার মতোই প্রায় অপরিহার্য হয়ে গেছে। আমরা জানি, এ সকল সামাজিক মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে সহজেই একে অন্যকে বার্তা বা মেসেজ পাঠানো যায়, খুব সহজেই পরিচিত-অপরিচিতজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যায় এবং সারা বিশ্বের সাথে সংযুক্ত থাকা যায়। কাজেই যুবারা যদি সতর্ক না থাকে, তবে তারা খুব সহজেই অসুন্দর বন্ধুত্ব বা মন্দ বন্ধুর পাল্লায় পড়ে যেতে পারে! ফেইসবুক, মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম, ইনস্টাগ্রাম প্রভৃতি যোগাযোগ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে যে কেউ প্রলোভিত হতে পারে। বিশেষ করে এসব মাধ্যমের মধ্যদিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত বা অন্তরঙ্গ ছবি যেকোনোভাবে আদান-প্রদান হতে পারে কিংবা সেগুলোই একসময় প্রকাশিত হয়ে যেতে পারে। এতে সেই যুবক বা যুবতীর জীবনে নেমে আসতে পারে দুঃসহ অন্ধকার! এখানে বলে রাখা ভালো, খ্রিস্টান মেয়েরা অন্য ধর্মের ছেলেদের দ্বারা অনেক বেশি প্রলোভিত হয়। এর অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, পোশাক-আশাকে খ্রিস্টান মেয়েরা সৌন্দর্যকে প্রাধান্য দেয়, ফলে সহজে তারা অন্যদের নজরে আসে। দ্বিতীয়, সংখ্যালঘু মনে করে অন্যরা প্রলোভিত করতে তুলনামূলক বেশি সাহস পায়। তৃতীয়ত, খ্রিস্টান মেয়েরা সহজ-সরল, নম্র-ভদ্র এবং প্রতিহত করার মতো তাদের শক্তি কম, তাই অন্যরা সুযোগ নিতে চায়। এছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে। তাই যুবারা বিশেষত মেয়েরা যদি সতর্ক না থাকে, তবে তারা সহজেই ভুল পথে পা বাড়াতে পারে। ফলে তাদের জীবন অকালে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বস্তুত এই ধরনের অসংখ্য উদাহরণ আমাদের সামনে আছে। বিশেষ করে অনেকে মিথ্যা প্রেমের ফাঁদে পড়ে নিজের সমাজ, সংস্কার ও বিশ্বাস ত্যাগ করে চলে গিয়েছে, কিন্তু স্বার্থ সিদ্ধি হওয়ার পর তাকে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে! অনেকেই তো আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে! এই অকাল প্রয়াণ কি আমাদের কাম্য হতে পারে?

বর্তমানে অনেক যুবক-যুবতী উচ্চতর পড়াশুনার জন্য বা পড়াশুনার পাশাপাশি খণ্ডকালীন চাকুরী করার জন্য দেশের বিভিন্ন শহরে থাকে। অনেকে আবার পড়াশুনা, নার্সিং বা প্রফেশনাল বিভিন্ন কোর্স সম্পন্ন করে পরিবার-পরিজন ছেড়ে দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাকুরী করে। অনেক শহরেই হয়তোবা গির্জা নেই অথবা থাকলেও তারা রবিবাসরীয় মিশায় অংশগ্রহণ করে না। এভাবে তারা দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। তারা যে এভাবে পরিজনদের আবহের বাইরে থাকে, তাদের দেখভাল বা যে কোন বিষয়ে তাদের শুধরে দেওয়ার যে কেউ থাকে না, এতে কি তারা নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে? নাকি অভিভাবকহীন ও পরিজনহীন জীবনে তারা ক্ষমাশীল পিতার গল্পের ছোট ছেলের মতো ভোগ-বিলাসে কাটাতে চায়? নাকি তারা নিজের মতো করে নিজের বিশ্বাসকে রক্ষা করে এবং পবিত্রভাবে জীবন-যাপন করে? অনেকগুলো প্রশ্ন এবং অনেকগুলো বাস্তবতা! কাজেই, একজন যুবক বা একজন যুবতী যদি প্রাপ্ত শিক্ষা ও মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে চলতে চায়, তবে তা খুবই সম্ভব। আর যদি না চায়, তবে উচ্ছন্নে যেতে তার সময় লাগার কথা নয়। এভাবে সে তার সুন্দর ও পবিত্র জীবনকে অচিরেই বিনষ্ট ও কলঙ্কিত করে ফেলতে পারে। অতীত আমাদের কাছে এরকম বহু সাক্ষ্য রেখে দিয়েছে।

আমরা সাধ্বী মারীয়া গরেট্টির কথা জানি। তিনি ইতালীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজের জীবনকে পবিত্রভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। তবে আলেক্সান্দ্রো নামের একটি যুবক ছেলে তাকে বার বার কুপ্রস্তাব দিতো। কিন্তু গরেট্টি নিজের পবিত্রতা নষ্ট করতে চাননি। তিনি আলেক্সান্দ্রোকে বলে দেন যে, তিনি পাপের পথে কখনই পা বাড়াবেন না। তাই একদিন ক্ষিপ্ত হয়ে আলেক্সান্দ্রো তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। তবে মৃত্যুর আগেই মারীয়া গরেট্টি আলেক্সান্দ্রোকে ক্ষমা করে দেন। অপবিত্রতার পথে পা বাড়িয়ে তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি পৃথিবীতে রক্ষা পেয়ে ঈশ্বরের কাছে দোষী সাব্যস্ত হতে চাননি। নিজের দৈহিক, মানসিক ও অন্তরের পবিত্রতা তিনি সর্বান্তকরণে রক্ষা করেছেন। তাই কাথলিক মণ্ডলীতে তাঁকে কৌমার্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, নির্যাতিতা, যুবা ও কিশোরীদের প্রতিপালিকার সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বর্তমানে আমরা লক্ষ্য করি, অসৎ উপায় অবলম্বন, ঘুষ বাণিজ্য, সিন্ডিকেট বাণিজ্য কিংবা অর্থের বিনিময়ে অসৎ কাজ করিয়ে নেওয়ার প্রবণতা প্রবল। বিভিন্ন অফিস আদালতে গেলে অর্থের বিনিময়ে খুব সহজেই কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। তাই সহজ হওয়ায় অনেকেই টাকার বিনিময়ে কাজগুলো করিয়ে থাকে। অন্যদিকে যারা টাকার বিনিময়ে কাজগুলো করেন, তাদের কিন্তু দায়িত্ব ছিল সকলের কাজ সময় মত করে দেওয়া। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে তারা কিছু ব্যক্তিকে বাড়তি সুবিধা দেন। একইভাবে অর্থ না দিলেও নাকি অনেক অফিসের ফাইল আটকা পড়ে থাকে! আবার অনেকে নিয়োগ পরীক্ষায় অনেক ভাল ফলাফল করার পরও অর্থের অভাবে কাজ পান না, পেয়ে যান অযোগ্য ব্যক্তিরা। মোটকথা, অসততা সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে ছড়িয়ে গেছে। মানুষ মাত্রই যেন অর্থলোভী! যুদাস কি অর্থলোভী ছিলেন না? তিনি কেবল অর্থের লোভে তার গুরুকে শত্রুর হাতে তুলে দেন! যুব সমাজও এখন বিভিন্ন কর্মে যুক্ত হচ্ছে কিংবা যুক্ত হওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। এই অর্থের লোভ কি তাদেরকেও গ্রাস করে? তারাও কি অর্থের বিনিময়ে কাজের সন্ধান করে? তারাও কি অর্থের বিনিময়ে অন্যকে কাজের সুযোগ করে

দেয়? তারাও কি সুগার ড্যাডিদের হাতের পুতুল হতে চায়? তারাও কি নিজেদের দেহ বল্লরীকে কাজ বা সুবিধা পাওয়ার হাতিয়ার করে নিতে চায়? সুতরাং প্রলোভন জয় করার মতো দৃঢ় বিশ্বাস ও খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ যেন যুবাদের সর্বদাই থাকে। নইলে তো পুনরুত্থানের অর্থই নেই! এ সকল পঙ্কিলতা থেকে উঠে আসাই তো পুনরুত্থান!

মারীয়া মাগদালেনার কথা আমরা জানি। তিনি পাপময় জীবন-যাপন করছিলেন। কিন্তু যখন তিনি যিশুর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর বাণী শুনেন, তখন তিনি তার সমস্ত কালিমা ও পাপময় জীবন ছেড়ে যিশুর পায়ের কাছে আশ্রয় নেন। প্রভু যিশু তাকে বলেন, "আর পাপ করো না" (*যোহন ৮:১১*)। এই মাগদালার মারীয়াই শেষ পর্যন্ত জীবনকে এমন ভাবে পরিবর্তন করেছিলেন যে, তিনি সৌভাগ্যবতী হয়েছেন। কারণ তিনি নিজেই খ্রিস্টের পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী, পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রথম কণ্ঠস্বর শ্রবণকারী এবং খ্রিস্টের প্রথম আদেশ গ্রহণকারী! (*যোহন ২০:১৭*)। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? মাগদালার মারীয়া পাপময়তা থেকে উত্থিত হয়ে পবিত্রতায় উন্নীত হয়েছেন, কাদা ও ময়লা জল থেকে ফুটে ওঠা শাপলার মতোই তিনি প্রস্ফুটিত হয়েছেন। আমরা মণ্ডলীতে অনেক সাধু-সাধ্বীর জীবনেও এমন আদর্শ দেখতে পাই যে, তারা কিভাবে পবিত্রতাকে আঁকড়ে ধরে জীবন-যাপন করেছেন। তাই সকল যুবারা যেন সেই আদর্শগুলো স্মরণ করে পবিত্র জীবন-যাপন করে। কেননা তাদের চারপাশের সমস্ত জগৎ তাদের প্রলুব্ধ করতে এবং তাদের জীবনকে কলুষিত করতে হায়েনার মতে তাকিয়ে আছে। তাই এসকল পঙ্কিলতা থেকে উঠে আসতে পারলেই তো খ্রিস্টের পুনরুত্থান সার্থক হবে! যুবাদের পুনরুত্থান তো এভাবেই হতে হয়! ❑

লেখক: সহকারী ছাত্র পরিচালক
নটর ডেম স্কুল এন্ড কলেজ,
শ্রীমঙ্গল

জ্ঞান অন্বেষায়

প্যাট্রিক সরদার

বিষয়ের শাব্দিক ব্যবচ্ছেদ: সংস্কৃত:
ভা+ রত= ভারত
বাংলা: জ্ঞান (ভা) + চর্চায় মগ্ন(রত)
= জ্ঞানী বা ধ্যানী

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় কালচারে পড়াশোনার নিমিত্তে সবাই ভর্তি হলেও বাকি দুটো প এর আক্রমণ থেকে বেঁচে ফেরা মোটামুটি অসম্ভব যদি না এক্সট্রা অরডিন্যারি কোন ব্যক্তিত্ব আপনি হন আর টিনএইজ বয়সের শেষ ধাক্কায় কজনই বা তখন এক্সট্রা অরডিন্যারি হবার পথে হাঁটে। যাইহোক প্রসঙ্গে থাকাই শ্রেয়- পড়াশোনা, পলিটিক্স আর প্রেম এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মূল সিলেবাস কেননা আবহাওয়াটাই এমন। এখনো যতবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি ততবারই একটা বিশাল জীবনবোধ এসে ভর করে নিজ মাঝে; মনে হয় প্রতিষ্ঠানটিকে এখনো কিছুটা ভিন্নভাবে Own করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মই হচ্ছে আপনার ভিতরকার মানবিক গুণাবলি গুলোকে বিকশিত হতে সাহায্য করা, বিশ্ব ধারণা প্রতিষ্ঠা করা সর্বোপরি পরম জ্ঞানকে খুঁজে পেতে কিছুটা গুরু শিষ্যের অভিজ্ঞতালব্ধ আদান প্রদানে জীবনের পথ খুঁজে ফেরা। জীবনে চলার পথে আপনাকে পড়াশোনার মানুষ হতেই হবে, প্রেমের মানুষ হতেই হবে আর ভালো মন্দ যেভাবেই দেখুন না কেন আপনাকে পলিটিকাল হতেই হবে যাকে Aristotle একটু চাঁচাছোলা ভাবে বলেছেন "Man is by nature a political animal" সেকুলার একাডেমিক স্কলাররা বিষয়টিকে আরোও খোলামেলা ভাবে তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে প্রাচীন যুগে প্লেটো বা কনফুসিয়াস, রেঁনেসন্স যুগে ফ্রান্সিস বেকন, লেট মডার্ণ যুগে কার্লমার্ক্স, বিংশ যুগে জ্যাঁ পল সার্ত্রে বা ফ্রেডরিক নিৎচে প্রমুখ। আজকের আলোচনায় মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ঋগ্বেদ, ভগবত গীতার ব্যক্তি চরিত্র গুলির ব্যাখ্যায় না গিয়ে, বুদ্ধ হতে কৌটিল্য হয়ে সমসাময়িক যুগের জয়কৃষ্ণমূর্তির প্রেম ও রাজনীতির ব্যাখ্যা সামনে আমরা রাখতেই পারি। যদিও প্রাচীন যুগ হিসেবে শেষ দিকের দার্শনিক ও ঐশতত্ত্ববিদ সেন্ট আগস্টিন ও আরও পরে মধ্যযুগে দার্শনিক ও ঐশতত্ত্ববিদ সেন্ট টমাস আকুইনাস এই প্রশ্নে ঐশতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা আদতে মানুষের Critical Political Thinking বা Intellectual Thought Process অথবা Men's Animalistic Behaviour কে কাটাছেঁড়া করে মানুষের মাহাত্ম্যকে আত্মার প্রশ্নে পরম আত্মায় তুলে ধরাই ছিল চিন্তকগণের স্ববিশেষ Divine Pathway। গুছিয়ে কিছুটা সংক্ষেপে বলতে গেলে মানুষের চিন্তার জগতে অনেক কিছুরই প্রভাব রয়েছে - সে হোক লৌকিক বা পরলৌকিক। লৌকিকতার মধ্যদিয়ে পরলৌকিকতাকে অর্থাৎ মৃন্ময়ীর মধ্যদিয়ে চিন্ময়ীকে আস্বাদনের পথ যারা একটু সহজ করে দেখিয়ে গেছেন তাঁদের মাঝে এই দুজন অন্যতম চিন্তক। অর্থাৎ আপনি বা আমি যেভাবে চিন্তা করি বা যেভাবে চিন্তা করা উচিত বলতে পারি, তারই এক রূপরেখা তাঁরা রেখে গেছেন। বিশ্বের কম বেশি সব ইতিবাচক নিয়ম বা জীবনাচার এনাদের Doctrine ও সর্বোপরি Christian Bible কেন্দ্রিক মূল্যবোধেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। যাই পৃথিবীতে Major Prospective -এ দেখছেন সবই Christian Law এর উপর দাঁড়িয়ে আছে আজও অবধি। যাইহোক মধুর ক্যান্টিনে আসলে আপনি কিছুটা হলেও দার্শনিক, পলিটিকালী আতেল বা চায়ের কাপে হাত রেখে বন্ধুত্বেও প্রেমকে কিছুটা নাড়িয়ে নিয়ে সমৃদ্ধ হতে চাইবেন। ঠিক তখনই বোধে কিছু একটা টোকা দিল, তাই লিখছি। পড়াশোনা চালিয়ে যান, নিজ জীবনের প্রতি অতঃপর আশেপাশের জীবের প্রতি প্রেম নিয়ে এগুতে থাকুন আর জীবন-যাপনে মহৎ উদ্দেশে নিরবতায় নম্র থাকুন, আত্মার কথা শুনুন, অন্যকে আপন করুন। অপর মূলত সে যে পর নয়, বিষয়টি অ যুক্ত পর যাহা পর নহে। এই হচ্ছে মূলত 'Being Politically Correct' এর চিন্তন। এখানে খুব স্পষ্ট করে বলে নেয়া উচিৎ, পলিটিক্স বলতে শুধু মাত্র বৃহৎ অর্থে জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতি বা সম্পর্ককে বোঝানো হচ্ছে না। আমাদের প্রতিদিনকার ব্যক্তিগত জীবন যাপনে নিজের সাথে নিজের সঠিক বোঝাপড়া সর্বোপরি পাশের মানুষটির সাথে পারস্পরিক সম্পর্কের বোঝাপড়া রক্ষার বিষয়টি সামগ্রিক অর্থে এখানে Core Politics এর বিষয়বস্তু। জীবনে নিজের সাথে বন্ধুত্বটি সঠিক রাখুন অতঃপর বন্ধুর জন্যে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত থাকুন। কেননা বন্ধুরাই আপনাকে সমৃদ্ধ করেন। এই বন্ধু হতে পারে আপনার পোষা প্রাণীটি, হতে পারে একখানা বই, হতে পারেন আপনার প্রিয়তম বা প্রিয়তমা, হতে পারেন একজন আধ্যাত্মিক গুরু, হতে পারে একটা Space বা Corner কিংবা স্বয়ং সেই জন যাকে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে দেখতে পাবার কথা বলেছেন আবার চিরদিন না দেখতে পাবার হাহাকারও করেছেন। Jesus Christ/যিশু স্বয়ং শত্রুকে ভালোবেসে বন্ধু করতে বলেছিলেন এবং তাঁর সর্বদা সম্ভাষণের মুখনিঃসৃত ভাষাই ছিল ভাই বা বন্ধু ডাক। অর্থাৎ তিনি সবকিছুকেই ভ্রাতৃত্বের, বন্ধুত্বের, সমতার ও ভালোবাসার মাপকাঠিতে আপন করে ভাবতেন। তাই তিনি মারা যাবার আগেও বলে গেছেন- "পিতা এদের ক্ষমা কর কারণ তারা যে কি করছে তা তারা জানে নাচ। এ-ও বলেছেন, "বন্ধুর জন্যে জীবন বিসর্জনের চেয়ে মহত্তর কিছু আর হতেই পারে না।" আসুন জ্ঞানে বাঁচি, সেবায় বাঁচি, প্রেমে বাঁচি, বন্ধুত্বে বাঁচি, জীবনের নান্দনিকতায় বাঁচি, সর্বোপরি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে বাঁচি কেননা আমাদের দৃষ্টি যেমন সৃষ্টিও তেমন আর চলুন একটু হাসি॥

এক মুঠো জোছনা

খোকন কোড়ায়া

মা মরা একমাত্র মেয়েকে আটলান্টিকের ওপারে বিয়ে দেবেন এটা কখনো ভাবেননি অমিত। রোদেলাও রাজি ছিলো না। বার বার বলছিলো, বাবা তোমাকে একা ফেলে আমি এত দূরে যাবো না। অমিত বুঝিয়েছেন, দেখ মা, বিয়েতো করতেই হবে। আমি আমার আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুদের কাছ থেকে খবর নিয়ে জেনেছি ছেলেটি ভালো, শিক্ষিত, ভালো চাকরি করে। যদিও আমেরিকায় বড় হয়েছে, বাঙ্গালি কালচারেই ওরা অভ্যস্ত। শুনেছি মা ভালো গান করেন, আর বাবা একসময় সেতার বাজাতেন, দুঃখজনক কভিডে উনি মারা গেছেন। পরিবারও ছোট, এক ভাই, এক বোন। বোনটির বিয়ে হয়ে গেছে, এখন শুধু মা আর ছেলে। রোদেলা বাবার কাঁধে হাত রেখে বলে, সবই বুঝলাম কিন্তু বিয়ে না করলে কি হয়? এই তো আমরা দুজন বেশ আছি। মেয়ের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে অমিত বলেন, আছিতো মা ভালোই, কিন্তু আমারতো বয়স হচ্ছে, এই ষাট পেরুলাম। রোগ-ব্যধি দেখা দিচ্ছে। তোর মা নেই, তোকে একটা নিরাপদ থিতু অবস্থায় রেখে যেতে না পারলে আমি শান্তি পাবো না। রোদেলা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি কোথায় যাবে? মনে রেখো একশ বছর বাঁচবে তুমি।

শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়। ফেসবুকের মাধ্যমে রোদেলা এবং ইভানের জানাশোনা হয়। তারপর দুজনের সম্মতি আছে এটা জানার পরই দু'পক্ষ অগ্রসর হয়। ইভানদের ঢাকায় কোন বাড়ি বা ফ্ল্যাট নেই, তাই মোহাম্মদপুরে মাসির ফ্ল্যাটে উঠে ওরা এবং ওখান থেকেই বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েকদিন পর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন নিয়ে ইভানদের বাসায় দাওয়াত খেতে যায় অমিত। ইভান এবং ওর মার জন্য উপহার সামগ্রীর সঙ্গে নিজের লেখা একটি ছোটগল্পের বইও নিয়ে যায় অমিত। বই পেয়ে ইভানের মা মিসেস লাবনী খুব খুশী হন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন, আপনি গল্প লিখেন? বই পড়া কিন্তু আমার হবি। বাংলাদেশে আসলেই আমি অনেক বই কিনে নিয়ে যাই। বেয়াই সাহেব, আপনার বই আমি অবশ্যই পড়বো।

দুদিন পর অসীম তার বাসায় দাওয়াত দেন মেয়ে-জামাই, বেয়ান এবং বেয়ানের বোনের পরিবারকে। চা নাস্তা খাওয়ার পর তার বেয়ান অমিতকে বলেন, বেয়াই আপনার বইয়ের অর্ধেক আমি পড়ে ফেলেছি। এনজয় করছি খুব। কিন্তু একটা গল্প পড়ে আমার মনে হয়েছে ঐ গল্পটি আমি আগে কোথাও পড়েছি কিন্তু কোথায় যে পড়েছি ঠিক মনে করতে পারছি না। অমিত হেসে বলেন, কোন গল্পটি? লাবনী বলেন, ঐ যে 'জয়মাল্য' নামের গল্পটি।

- আমি কিন্তু বলে দিতে পারি আপনি গল্পটি কবে, কোথায় পড়েছিলেন।
- আপনি? সেটা কিভাবে সম্ভব? বলুনতো দেখি।
- গল্পটি আপনি পড়েছিলেন আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, মুন্নি লঞ্চের আপার ক্লাসে বসে।
- তাই নাকি? মনে পড়ছে নাতো!
- চেষ্টা করুন, মনে পড়বে। আচ্ছা আমি একটু ক্লু দিচ্ছি। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে, আপনি তখন ঢাকার লালমাটিয়া মহিলা কলেজে বিএ প্রথম বর্ষে পড়েন। ডিসেম্বরের ২৩ তারিখে লঞ্চে করে বাড়ি যাচ্ছিলেন বড়দিন করার জন্য। আপনার পাশে একটি রোগা পাতলা ছেলে বসেছিলো। ছেলেটির হাতে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যাটি ছিলো।
- হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে। আমি ছেলেটিকে বলেছিলাম, প্রতিবেশীটা একটু দেখা যাবে? ছেলেটি কিছু না বলে আমার হাতে প্রতিবেশী তুলে দিয়েছিলো। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটি গল্পের দুটি লাইন পড়ে আমার ভালো লেগেছিলো এবং তারপর আমি গল্পটি পড়তে শুরু করি। কিছুটা পড়ার পর ছেলেটি বলে, কি পড়ছো তুমি? আমাদের এলাকায় আমরা তখন ছোট বড় সবাইকেই তুমি বলে সম্বোধন করতাম। তাই ছেলেটি তুমি বলায় মাইণ্ড করিনি। বললাম, 'জয়মাল্য' নামে একটি গল্প পড়ছি। তারপর আমি একটানে গল্পটি পড়ে শেষ করলাম।
- তারপর ছেলেটি আপনাকে জিজ্ঞেস করলো, কেমন লাগলো গল্পটি? আপনি বললেন, খুব ভালো। এরপর ছেলেটি লাজুক ভঙ্গিতে বললো, গল্পটি আমার লেখা। আর আপনি হো হো করে হেসে বললেন, গুল মারার আর জায়গা পাওনা! ঠিক বলেছি না?
- ঠিক। কারণ গল্পের ভাষা, কাহিনী, আঙ্গিক, গাঁথুনি ছিলো বেশ ম্যাচিউর, ছেলেটির বয়স ছিলো বড়জোর ষোল/সতের, ঐ বয়সে ওরকম একটা গল্প লেখা সম্ভব নয়। ছেলেটি ছিলো শান্তশিষ্ট কিন্তু লেজবিশিষ্ট তাই আপনার লেখা গল্পটি নিজের নামে চালাতে চেয়েছিলো।
- ছেলেটির বয়স কিন্তু ষোল/সতেরো ছিলো না, বিশ ছিলো এবং সে তেজগাঁও কলেজে বিকম প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলো।
- কিন্তু আপনি এত কিছু জানলেন কি করে? ঐ ছেলেটি কি আপনার পরিচিত ছিলো?
- ভীষণ পরিচিত কারণ গল্পটি ঐ ছেলেরই লেখা ছিলো।
- তার মানে, আপনি...!
- জ্বি।
- কিন্তু আমি আপনাকে চিনতে পারলাম না কেন?
- দুটি কারণে চিনতে পারেননি। প্রথমত: তখন আমাকে দেখতে বয়সের তুলনায় আরো কমবয়সী মনে হতো আর এখন বয়সের তুলনায় বেশি বয়স্ক মনে হয়। অর্থাৎ এই চল্লিশ বছরে আমার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয়ত: সেদিন আপনি আমার গল্প আর প্রতিবেশী নিয়ে এতটাই মশগুল ছিলেন যে আমার দিকে ভালো করে তাকাননি। তবে আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনতে পেরেছি। তবে নিরানব্বই ভাগ নিশ্চিত ছিলাম, আর আজ যখন বললেন, আপনি 'জয়মাল্য' গল্পটি আগে কোথাও পড়েছেন, তখন একশত ভাগ নিশ্চিত হলাম।
- কিন্তু আপনি আমাকে চিনতে পারলেন কিভাবে?
- প্রথমত: আপনি যখন একাগ্র মনে আমার গল্প পড়ছিলেন, আমি আপনার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলাম। দেখছিলাম আপনার মুখের অভিব্যক্তির পরিবর্তন। কখনো আপনার মুখে ফুটে উঠছিলো হাসির রেখা, কখনো বেদনার ছায়া, আবার কখনো ক্ষোভের চিহ্ন। তখন আমি লক্ষ্য করেছিলাম হাসলে আপনার গালে টোল পড়ে, আপনার রয়েছে সুন্দর জোড়াদাঁত

আর চিবুকে একটি কালো তিল। দ্বিতীয়তঃ এই চল্লিশ বছরে আপনি কিন্তু খুব বেশি বদলাননি।

- কি যে বলেন! বুড়ি হয়ে গেছি না!
- না পরিণত হয়েছেন, তবে বুড়ি হননি এখনো। সেদিন মরিচা ঘাট পার হওয়ার পর আপনি আমাকে 'প্রতিবেশী' ফেরত দিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, দিদি তুমি কোথায় পড়?
- আপনি বলেছিলেন, লালমাটিয়া মহিলা কলেজে বিএ ফার্স্ট ইয়ার। তুমি?

আমি ভাবলাম আমি যদি সত্যিটা বলি, আপনি বিশ্বাস করবেন না, তাই মিথ্যে বললাম, বান্দুরা হলিক্রসে ক্লাস টেনে। এটা শোনার পর আপনি আমার অপাদমস্তক আপনার তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে ভালোমতো তল্লাশী করলেন। আপনি নেমে গেলেন বক্সনগর ঘাটে। আমার গন্তব্য বান্দুরা।

আমি বাইরে গিয়ে লঞ্চের রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। আপনার ব্যবহারে একটু কষ্ট পেয়েছিলাম, তবে পুলকিত হয়েছিলাম অনেক বেশি, গল্পটি আপনার ভালো লেগেছে জেনে। জল কেটে কেটে লঞ্চ এগিয়ে যাচ্ছিলো ছন্দময় গতিতে ইছামতি নদী দিয়ে। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম দুপাশের দৃশ্য। কত রকম নৌকা ভেসে বেড়াচ্ছে নদীতে, পালের নৌকা, কেড়ায়া নৌকা, কোষা নৌকা, ধানের নৌকা, বালুর নৌকা। নদীর ঘাটে স্নান করতে নেমেছে একটি পরিবার, একটি যুবতী বউ তার স্বামীর পিঠে সাবান ঘষে দিচ্ছে। কেউ কেউ আবার গবাদি পশুকে স্নান করাচ্ছে। কয়েকটি কিশোর স্নান করতে নেমে বল নিয়ে লোফালুফি খেলছে আর হুল্লোর করছে। দূরে দেখা যাচ্ছে একটি বালিকা মাথায় করে তার কৃষক বাবার জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে যাচ্ছে। নদীতে বড়শি ফেলে ছাতা মাথায় দিয়ে বসে আছে এক বৃদ্ধ। নদীর পাড়ে একটি ছাগল লাফিয়ে লাফিয়ে ছোট কাঁঠাল গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খাচ্ছে। এইসব পরিচিত দৃশ্য সেদিন নতুন করে আমি আবার উপভোগ করেছিলাম।

- স্যরি বেয়াই। সেদিন আপনাকে আণ্ডারএস্টিমেট করেছিলাম বলে।
- ওটা কোন বিষয় নয়। আমার গল্পটি যে আপনার ভালো লেগেছিলো, আপনি উপভোগ করেছিলেন, সেটাই ছিলো আমার বড় পাওনা।

দিন-দশেক পর রোদেলা আর ইভান যখন হানিমুন করতে ব্যাংকক গেছে তখন বেয়াই বেয়ানকে দেখা গেলো মাওয়া ঘাট থেকে ট্রলারে চড়ে পদ্মা সেতু দেখছেন। ঢাকায় ফেরার পথে লাবনী বলেন, অনেক ধন্যবাদ বেয়াই, এই কয়েকদিনে আমাকে অনেক কিছু দেখালেন। আসলে ঢাকার আশেপাশে যে এত দর্শনীয় স্থান রয়েছে আমার জানা ছিলো না। তবে আপনারও পাওনা রইলো। আপনি যখন নিউইয়র্কে যাবেন, আমিও আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাবো অনেক কিছু।

ওদের গাড়িটি তখন ধলেশ্বরী নদীর ব্রিজের ওপর। অমিত বললেন, বেয়ান, শুনেছি আপনি ভালো গাইতে পারেন। শোনাবেন নাকি একটি গান?

- গাইতে পারি, যদি আপনি কণ্ঠ মেলান।

সুরেলা কণ্ঠে লাবনী শুরু করলেন, "আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, শাখে শাখে পাখি ডাকে, কত শোভা চারিপাশে।" কণ্ঠ মেলালেন অমিতও॥ ❑

লেখক: প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম
বিশিষ্ট গল্পকার ও ছড়াকার

হৃদয়ে প্রিয়জন

ইনোসেন্ট নির্মল ডি'কস্তা

যতদিন মানুষটা জীবিত ছিল, ততদিন তাকে দেখেছি, কথা বলেছি, ভাবের আদান প্রদান করেছি, তার ভালোবাসা পেয়েছি, সুখ-দুঃখ ভাগ করেছি। সে ছিল আমার বাবা অথবা মা, ভাই অথবা বোন, স্বামী অথবা স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে বা কোন ঘনিষ্ঠজন। বছরের পর বছর অনেক দূরে থাকলেও জেনেছি সে আছে এবং তার অস্তিত্ব অনুভব করেছি, তার ভালোবাসা অনুভব করেছি এবং আশায় বসে থেকেছি একসময় তাকে দেখব বলে। দূরে থাকুক বা কাছে থাকুক, যেদিন শুনতে বা জানতে পারলাম সেই প্রিয় মানুষটি আর নেই, সেদিন অনেক দুঃখ পেয়েছি আর কেঁদেছি। সেই বিয়োগ ব্যথা মেনে নিতে অনেক কষ্ট হয়েছে। কষ্ট পেয়েছি এই ভেবে যে, মানুষটাকে এতদিন চোখের সামনে দেখতে পেতাম, তাকে আর কোনদিন দেখব না, চিরকালের মত চোখের আড়ালে চলে গেল।

ঘনিষ্ঠজন একদিন চোখের আড়ালে চলে যায় বটে, কিন্তু মন থেকে বা হৃদয়ের অনুভূতি থেকে কোনদিনও মিলিয়ে যায় না বরং আরও গভীরভাবে অন্তর জুড়ে জাগ্রত থাকে। জীবিতকালে যেমনভাবে মানুষটাকে অন্তরে অনুভব করেছি, মরণের পরেও ঠিক একইভাবে তার উপস্থিতি অনুভব করি। আসলে পরলোকগত আত্মীয়রা আমাদের আত্মায় আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনই আছে, তারা কোথাও চলে যায়নি। শুধুমাত্র অসার দেহটা নেই যা নিতান্তই গৌণ। আসল সত্যটা বুঝে ওঠা আমাদের কাছে বড়ই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাই আমরা প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ি। পৃথিবীতে যা কিছু চোখে দেখা যায় তার কিছুই চিরন্তন সত্য নয়, এই আছেতো এই নাই। চিরন্তন সত্যকে কোনদিন চোখে দেখা যায় না।

যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় "তুমি কি তোমার বাবাকে বা মাকে কোনদিন দেখেছো? তবে সে নিশ্চয়ই উত্তর দিবে "এটা কি কোন প্রশ্ন হল? আমি অবশ্যই তাদের দেখেছি, যখন তারা জীবিত ছিল। "আর জীবিত থাকলে বলবে "তাদের সবসময় দেখতে পাচ্ছি।" আসল সত্যটা কি তাই? সত্যই কি আমরা আমাদের ঘনিষ্ঠজনদের দেখেছি বা দেখতে পাচ্ছি? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে, আসলে আমরা কোনদিনই আমাদের বাবা-মা অথবা ঘনিষ্ঠজনদের বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পাইনি এবং দেখতে পাইও না। আমরা আমাদের রক্ত মাংসের চোখ দিয়ে জীবিতকালে তাদের শুধু দেহটাকে দেখতে পাই, তাদের দেহের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া দেখতে পাই, তাদের দেহের পরশ পাই, কথা শুনতে পাই আর নানা রকম অভিব্যক্তি দেখতে পাই মাত্র। সত্যিকারের বা আসল মানুষটাকে আমরা কোনদিনই রক্ত মাংসের চোখে দেখতে পাই না। সেই ভিতরের মানুষটাকে আমরা শুধু অন্তরে অনুভব করি, তার ভালোবাসা, আমাদের প্রতি তার আচরণ, দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, আমাদের আত্মার সাথে তার আত্মার এক অদৃশ্য বন্ধন সৃষ্টি করে যা চোখে দেখা যায় না। পরস্পরের সাথে সেই আত্মার বন্ধন আর অনুভূতিটাই আমাদের আত্মীয় প্রিয়জন যা চিরন্তন সত্য। দেহের প্রস্থান আছে কিন্তু আত্মার প্রস্থান কোনদিন হয় না। তাই জীবিতকালে যাদের বাবা, মা বলে ডাকতাম, মৃত্যুর পর বলি মা-বাবা, ভাই-বোনের মৃতদেহ।

আমাদের সমস্ত পরলোকগত ঘনিষ্ঠ জনেরা আমাদের অন্তরাত্মার ভিতরেই লুকিয়ে আছে। বিভিন্ন বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে আমরা তাদের উপস্থিতি আমাদের অন্তরেই টের পাই, তাদের গভীরভাবে অনুভব করি। একজন মা, কিভাবে তার চিরদিনের মত হারিয়ে যাওয়া একমাত্র ছেলেকে বুকের মাঝে পেয়ে শান্তি পেয়েছিল সেই কাহিনীটা শুনাই।

বেকার দুই বন্ধু গ্রাম থেকে শহরে এসেছে কর্মসংস্থানের খোঁজে। দিনের পর দিন অনেক ঘুরাঘুরি ও খোঁজাখুঁজি করেও কোন কাজ যোগাড় করতে পারল না। এদিকে টাকা পয়সা যা সাথে এনেছিল সব প্রায় শেষ, কিছু একটা না করলে তাদের দিন চলবে না। খালি হাতে বাড়ি ফিরে যাওয়াও সম্ভব না। কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দু'জন। একসময় তারা একটা ফাঁকা ময়দানে এসে পড়ল এবং লক্ষ্য করল ময়দানের একদিকে একটা বটগাছের নিচে অনেক মানুষের ভিড়। দু'জন সেখানে গিয়ে দেখতে পেল এক সাধু বাবা বসে আছে তার কয়েকজন শিষ্যের সাথে। তার চারিদিকে অনেক ভক্তজনের ভিড়, সবাই তাদের নানা সমস্যার কথা সাধু বাবাকে বলছে আর সাধু বাবা তাদের পানি পড়া দিয়ে ও নানা ভঙ্গিতে ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্র দিয়ে সব সমস্যার সমাধান দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতও বলে দিচ্ছে অনেকের। এই করে খুব ভালই অর্থ উপার্জন হচ্ছে সাধু বাবাজীর। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাধু বাবাজীর কাণ্ড দেখে দুই বন্ধুর মাথায় নতুন বুদ্ধি এলো, এতো খুবই সহজ উপায়ে অর্থ উপার্জনের সুন্দর পথ। তারা দুজন সিদ্ধান্ত নিল, এই ব্যবসাই শুরু করবে। দু'জনের মধ্যে একজন ছিল খুবই বুদ্ধিমান ও চালাক এবং অন্যজন ছিল খুব পরিশ্রমী। তারা আর সময় নষ্ট না করে একটা ঘর ভাড়া নিল। চালাক ও বুদ্ধিমান বন্ধু সেজেগুজে সাধু বাবাজী হয়ে ঘরের মধ্যে ধ্যানে বসে গেল। অন্যজন নতুন সাধু বাবাজীর নানা গুণগান প্রচার করতে লাগলো মক্কেল ধরার জন্য। কিছুদিনের মধ্যে নতুন বাবাজীর অনেক ভক্ত জুটে গেল। বুদ্ধিমান ও চালাক বাবাজীর মন্ত্রে ও চিকিৎসায় ভক্তরা অনেকে কাকতালীয়ভাবে ভালই ফল পেতে লাগলো এবং আয়ও হতে লাগলো মন্দ না।

ওই শহরে এক মা তার মেয়েকে নিয়ে বসবাস করত যার একমাত্র ছেলে বিদেশে চাকরি ও পড়াশুনা করত। প্রতি বছর মা ছেলের জন্মদিন পালন করত এবং ছেলে প্রতি বছরই জন্মদিনে উপস্থিত থেকে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করত। এইভাবে মাও তার একমাত্র প্রিয় ছেলেকে প্রতি বছর তার বুকে জড়িয়ে ধরে পরম তৃপ্তিতে আশীর্বাদ করত এবং আদরযত্ন করত যতদিন সে মায়ের কাছে থাকতো। কিন্তু, মানুষ যেভাবে চায় ঈশ্বর সেভাবে চান না। এক জন্মদিনে মা তার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে ছেলের আসার প্রতীক্ষায় কিন্তু ছেলে আর সেবার এলো না। মা মনে অনেক কষ্ট পেল। সে জানতে পারলোনা যে তার ছেলে আর কোনদিনই আসবে না কারণ সেইবার জন্মদিনে বাড়ি আসার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিখোঁজ হয়েছে। বোন, ভাইয়ের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর জেনেছে বটে, কিন্তু মাকে কিছুই জানতে দেয়া হয়নি, মা এই ব্যথা সইতে পারবে না বলে। মাকে বোঝানো হয়েছে, দাদা তার পড়াশুনা ও কাজের ব্যস্ততার জন্য এবার আসতে পারল না, আগামী বৎসর অবশ্যই আসবে বলে জানিয়েছে। তখনকার দিনে আজকালের মত এত আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো না। প্রতিবছর মা ছেলের জন্মদিনের আয়োজন করে অপেক্ষায় বসে থাকে কিন্তু ছেলে আর আসে না। প্রতিবছরই বোন কোন না কোন একটা অজুহাতে মাকে কোনরকমে বুঝিয়ে রাখে এবং সান্ত্বনা দেয় আর সমস্ত কষ্ট নিজের বুকে ধারণ করে রাখে। এমনি করে অনেকগুলি বছর কেটে গেল, মায়ের মন কিছুতেই মানে না। ছেলের ভাবনায় মা অসুস্থ হয়ে পড়লো, দৃষ্টিশক্তি প্রায় হারিয়ে ফেললো, ঠিকমত শুনতেও পায় না। তবুও প্রতি বছর মা তার প্রিয় ছেলের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে থাকে।

ওদিকে নতুন সাধু বাবাজীর বেশ সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। ছেলের প্রতীক্ষায় থাকা মাও নতুন সাধু বাবাজীর খবর জানতে পেরেছে। একদিন মেয়ের হাত ধরে মাও ঐ সাধু বাবাজীর আস্তানায় গিয়ে হাজির হল। মা সাধু বাবাজীকে অনেক অনুরোধ করে বলল, "বাবাজী, তুমি আমাকে বলে দাও, বিদেশে আমার ছেলে কেমন আছে, এবার আমার ছেলে আসবেতো? আমি প্রতিবছর তার জন্মদিনে পথ চেয়ে বসে থাকি।" সাধু বাবাজীতো আসল ঘটনার কিছুই জানে না। মায়ের কথা শুনে বুঝে নিল, প্রতি বছর যখন মা ছেলের জন্মদিনে তার আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে, তবেতো ছেলে আসবেই। বেশি কিছু না ভেবে বাবাজী চোখ বন্ধ করে মাকে বলে দিল, "মা, তোমার ছেলে বিদেশে খুব ভাল আছে এবং এবার জন্মদিনে সে অবশ্যই তোমার কাছে আসবে।" মা সাধু বাবাজীর কথায় সান্ত্বনা পেল এবং সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে ঘরে ফিরে গেলো। বোন মাকে বাইরে বসিয়ে রেখে ফিরে এসে সাধু বাবাকে বলল "আপনি এ কী করলেন? কেন মাকে মিথ্যা আশ্বাস দিলেন? দাদাতো জীবিত নেই, মা তা জানে না, আমি মাকে প্রতি বছর, দাদা তার নানা ব্যস্ততার জন্য আসতে পারল না বলে বুঝিয়ে রেখেছি। মা আপনার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছে, এবার মা দাদাকে না পেয়ে যে প্রচণ্ড আঘাত পাবে, তার জন্য আপনি দায়ী থাকবেন।" যুবক সাধু বাবাজী বোনের সব কথা শুনে মায়ের জন্য ব্যথা অনুভব করল এবং নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে একটু সময় নিয়ে ভেবে-চিন্তে বোনকে বলে দিল, "বোন, আপনি আপনার ভাইয়ের জন্মদিনে সমস্ত আয়োজন করে মাকে নিয়ে অপেক্ষা করবেন। আমি কথা দিচ্ছি, আপনার ভাই এবার তার জন্মদিনে অবশ্যই আসবে, মা তার ছেলেকে তার বুকের মাঝে পাবেই।" সাধু বাবাজীর কথা মতো বোন তাই করল আর মা আশায় বুক বেঁধে বিশ্বাস নিয়ে ছেলের অপেক্ষায় বসে রইল। বোন বুঝতে পারছে না কি হবে, তাকে বলা হয়েছে, সে যেন কোন কথা না বলে, শুধু দাদাকে গ্রহণ করে, যখন সে আসে।

মায়ের অধীর প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ঠিকই, মা, মা বলে জন্মদিনে ছেলে ঘরে এসে মাকে জড়িয়ে ধরল আর অন্ধপ্রায় মা-ও এতদিন পরে আদরের সন্তানকে বুকের মাঝে পেয়ে পরম তৃপ্তি ও শান্তি অনুভব করল এবং প্রাণভরে ছেলেকে আশীর্বাদ করল। দু'জনের চোখেই আনন্দের অশ্রু বইতে লাগলো। পরে, ঘরের বাইরে এসে বোন বলল "দাদা, আপনি আমার মায়ের জন্য আজ যা করলেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে চির কৃতজ্ঞ থাকব"। যুবকটি উত্তরে বলল "না বোন, বরং আমিই আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। সাধু সাজতে গিয়ে আমি যে আমার মাকে আমার বুকের ভিতর খুঁজে পেয়েছি! যেমন আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আপনার মা-ও তার ছেলেকে নিজের বুকের মধ্যে খুঁজে পেয়েছে। প্রতি বছর আপনার দাদা আসবে জন্মদিনে মায়ের আশীর্বাদ নিতে।

প্রিয়জন কখনোই আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যায় না, তারা হৃদয়ের গভীরে সর্বদাই লুকিয়ে থাকে॥ ❑

লেখক: এনজিও'র প্রাক্তন কর্মকর্তা ও সংগঠক

তোমার চলে যাবার পাঁচটি বছর

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার প্রিয় পুত্রগণ, কন্যা, স্ত্রী, নাতি-নাতনী, পরিবার-পরিজনসহ অসংখ্য প্রিয়জনদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেছো। তোমাকে ছাড়া আমাদের গৃহ শূন্য তোমার স্পর্শ আজও পরিবারে জড়িয়ে আছে।

পরম করুণাময় প্রভুর কাছে আমাদের একটি চাওয়া তিনি যেন তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে রাখেন। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

Robin Rozario
Born: 4th May 1947
Died: 23rd March 2019

প্রয়াত রবীন রোজারিও
জন্ম : ৪ মে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৩ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

তোমার শোকার্ত পরিবার

ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, আপনজন
ও
স্ত্রী : প্রণতি রোজারিও

মহাখালী খ্রিস্টান পাড়া
গ্রামের বাড়ি : দড়িপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৬৯/২৪

তোমাদের স্মরি

সুপ্রিয়ান রোজারিও

সিলভেস্টার রোজারিও

ড্যাঞ্জেল রোজারিও

ডানিয়েল কুলেন্ডু

টাইনি রোজারিও

রেখা রোজারিও

উষা রাণী পালমা

"সত্যনিষ্ঠা বিনম্রতার আদর্শ করে দান
আত্মত্যাগের পরম ব্রতে হল তারা মহীয়ান
ভালোবাসার প্রতীক হয়ে রইল অনুক্ষণ।"

ঈশ্বরের অসীম দয়ায় ও ভালোবাসায় তোমরা এ পার্থিব জগৎ থেকে স্বর্গের অনন্ত সুখ লাভ করেছ। তোমরা আজও আছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা আদর্শ জীবন-যাপন করতে পারি এবং তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি।

শোকার্ত চিত্তে
তোমাদেরই সংসার পরিজন
করান, নাগরী ধর্মপল্লী।

বিজ্ঞ/৬৮/২৪

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত যোসেফ পালমা

জন্ম: ১৫ মার্চ, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১০ এপ্রিল, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় বাবা,

দেখতে দেখতে একটি বছর এসে গেলো তুমি আমাদের মাঝে নেই। এই তো সেদিন মাত্র তোমার সাথে ফোনে কথা বললাম, বলেছিলে তুমি অসুস্থ্য, দেশে চলে আসছো তারাতাড়ি। জানো বাবা কত অপেক্ষায় ছিলাম আমরা, তুমি আসবে আমাদের সাথে কথা বলবে হাসবে। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস দেখো, কিছুই হলো না। তুমি আসলে ঠিকই কিন্তু আমাদের সাথে একটা কথাও বলতে পারলে না। আমাদের দেখে একটু হাসতেও পারলে না। তোমাকে অনেক মিস্ করি বাবা। বাবা বলে আর ডাকতে পাড়বো না। কেউ আর ফোন দিবে না, কেউ বলবে না আমি ভালো আছি চিন্তা করো না। সবই স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে।

তুমি ভালো থেকো বাবা। তোমাকে খুব ভালোবাসি আমরা তোমার স্নেহ ভালোবাসা, আদর্শ আমাদের পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো।

তোমারই শোকার্ত প্রিয়জন
স্ত্রী: চন্দনা গ্লোরিয়া কস্তা
মেয়েরা: জেরিন ম্যাগ্ডেলিন পালমা ও অরিন জসিন্তা পালমা

বিজ্ঞ/৭৫/২৪

আমার প্রাণের 'পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।

সে যে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল রে--
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত

২০তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জন পিটার কস্তা

জন্ম: ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ.: কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর

৩য় মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত লতিকা জার্লেট কস্তা

জন্ম: ৪ এপ্রিল, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৮ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া, পো.অ.: কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর

প্রকৃতির অমোগ বিধান,"জন্মিলে মরিতে হইবে"। দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল অনেক সময়, তোমরা চলে গেছ পরপারে, স্নেহ ভালোবাসার বন্ধন ছিন্ন করে। তোমাদের স্নেহ ভালোবাসায় ধন্য আমরা। প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমাদের শূন্যতা। তোমাদের অমায়িক হাসি, সরলতা, সদালাপ, উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, স্নেহপরায়ণতা, হৃদয়গ্রাহী ভালোবাসা আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয় নীরবে নিস্তব্ধতায়। তোমরা ছিলে, আছ, থাকবে আমাদের ভালোবাসা হয়ে, অন্ধকারে আলো হয়ে, সুদিন হয়ে প্রতিদিন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে -

ছেলে ও ছেলে বউ : পলাশ ও লিজা
মেয়ে : লিপি, নূপুর, ঝুমুর ও ঝুমা

মেয়ে জামাই : প্রদীপ, বিলাশ ও রিচার্ড
নাতি : স্ট্রীগ, রিদম ও পিটার-পার্থিব
নাতনি : স্ক্যাবি, স্ক্যালি, স্ক্যারি, লীথী, লরা, রায়না ও লিরিক।

বিজ্ঞ/৭৭/২৪

বিদেশে উচ্চশিক্ষা/ভিজিট ও ওয়ার্ক-পারমিট ভিসা

Australia, USA ,Canada ও Japan-এ আমাদের সাম্প্রতিক সফলতার কিছু বাস্তব চিত্র :

Student Visa: Australia, Canada, USA, UK, Schengen Countries, Japan, South Korea, Malaysia তে Study Visa প্রসেস করছি।
Work Permit Visa: চুক্তি ভিত্তিতে আমরা ইউরোপের বিভিন্নদেশ ও জাপানের ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় কাজ করছি।
Visit Visa: অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইউএসএ, ইউরোপ ও জাপানের ভিসিট ভিসা প্রসেসিং করা হয়।

খ্রিস্টান মালিকানা দ্বারা পরিচালিত আমরাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাদের Foreign Admission & Visa Processing-এ বিগত ২১ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে।

Global Village Academy
STUDY ABROAD CONSULTANTS

Head Office:
House-11 (2nd Floor), Road-2/E,
Block-J, Baridhara, Dhaka-1212

+88 01894-767125
+88 01911-052103

globalvillageacademybd
info@globalvillagebd.com

বিজ্ঞ/৭১/২৪

"মরণসাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, তোমাদের স্মরি।"

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত জন ব্যাপ্টিষ্ট ডি'কস্তা (নায়েব)
মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত আগ্নেস রড্রিক্স
মৃত্যু : ১২ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত ক্যাথরিন ডি'কস্তা (হাসি)
জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ মার্চ, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত এভারিশ পেরেরা
জন্ম: ৩০ জানুয়ারি, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৩ মার্চ, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

প্রয়াত ফিলোমিনা কস্তা
জন্ম: ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৪ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই স্মৃতিময় শোকাহত স্মরণীয় দিনগুলি, যে দিনগুলিতে তোমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গেছো। তোমাদের স্মৃতি আজও আমাদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর যেন আমরাও তোমাদের পবিত্র জীবন ও আদর্শের অনুসারী হতে পারি।
পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায়–

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –

এড্ওয়ার্ড ডি'কস্তা

ছেলে-ছেলে বউ	:	হিউবার্ট-জ্যোৎস্না, রিচার্ড-চন্দনা, রেমন্ড
মেয়ে-মেয়ে-জামাই	:	লাভলী-বিপিন, লাইলী-রবার্ট, লীনা-লিটু, লীজা-আকাশ
নাতি-নাতনীরা	:	কিষাণ, কুন্তল, কৌশল, রিন্‌ভী, কলিন্স, কান্তা, ব্রেন্ডা, ব্রেডেন, গ্রেস, এঞ্জেল, মাধুর্য, মুগ্ধ, রোজলীন-সাগর, রিয়া-কলিন্স, এলভিস ও পূর্ণতা
পুতিন	:	অরলিন ও এ্যারন

বিজ্ঞ/৭০/২৪

আমার পলায়ন

ডেভিড স্বপন রোজারিও

সামারে ওয়াশিংটন সিটি, সিয়াটলে, ছেলে সৈকতের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি। "প্রশান্ত মহাসাগর" এর তীরে ওর বাড়ি। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এটি একটি উত্তম স্থান। মনোরম পরিবেশ, চমৎকার আবহাওয়া-বেশি শীতও নয়, আবার বেশি গরমও নয়। কিন্তু প্রায়ই সময়-অসময়ে ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে। সিয়াটলের পাহাড়ি রাস্তায় সকাল-বিকাল হাঁটতে বের হই। ঢেউ খেলানো উঁচু নিচু রাস্তা। এ পথে হাঁটতে প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হলেও, পরে বেশ অভ্যস্থ হয়ে পড়েছিলাম। পথের দু'পাশে সুন্দর ছবির মতো সাজানো বাড়ি-ঘর এবং প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। পাহাড়ের ওপর থেকে দূরে বিশাল প্রশান্ত সাগরের অফুরন্ত জলরাশি, চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নীল সমুদ্রে মাছ ধরার ট্রলারগুলি, পণ্য ও যাত্রীবাহি বড় বড় জাহাজ ছুটে যাচ্ছে, দেখতে ভালই লাগে। নির্মল সামুদ্রিক হাওয়ায় দেহ-মন শীতল করে দেয়। ঐ দৃশ্য, আমার শোবার ঘরের জানালা দিয়ে নিত্য ঘুম ভাঙ্গলে, মুগ্ধ হয়ে, চেয়ে চেয়ে দেখতাম। প্রাতঃভ্রমণের সময় অনেকে নানা জাতের কুকুর নিয়ে বের হোত। হ্যালো বলে, এরা যে যার পথে এগিয়ে যেতো।

প্রায়ই রাস্তার ধারে চোখে পড়তো দু'চালার কাঠের তৈরী খোলা ছোট্ট লাইব্রেরী। যেখানে নানা ধরনের বই থাকে এবং লেখা Free, যে কেউ পড়ার জন্য নিতে পারে। বিশ্বখ্যাত নামি-দামী নেতাদের জীবনী পেলে, আমি পড়ার জন্য আনতাম। যেমন-ABRAHAM LINCOLN, DIANA, ANCIENT ROME, ইত্যাদি, আবার পড়া শেষে যথাস্থানে রেখে আসতাম।

পথে যেতে যেতে, মাঝে মাঝেই ল্যাম্প পোষ্টে নানা ধরনের বিজ্ঞাপন চোখে পড়তো, ট্যাগ-ইয়ার্ড ও গ্যারেজ সেল, ইত্যাদি। "সামারে" (SUMMER) আমেরিকার অন্যান্য শহরের মতো, এখানেও নানা স্থানে ট্যাগ সেল, গ্যারেজ সেল, ইয়ার্ড সেল ও ষ্ট্রিট সেল বসে। অনেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র এভাবে বিক্রি করে দেয়। কেউবা বাড়ি বদল করে একস্থান থেকে অপর স্থানে, কিংবা এক শহর থেকে অপর শহরে বদলী হয়ে যায়, তখন বাড়ির সমস্ত জিনিস সস্তায় বিক্রি করে দেয়। বিক্রির পূর্বে বিভিন্ন রাস্তায় লাইট পোষ্টে, স্থান ও সময় উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। এরই মাঝে কারও কারও অত্যন্ত প্রিয় পোষা কুকুর-বিড়ালের হারানো বিজ্ঞপ্তিও চোখে পড়ে।

একদিন প্রাতঃভ্রমণে অন্য মনস্ক হয়ে হাঁটছিলাম, আমাদের বাড়ির অনতি দূরে লাইট পোষ্টে একটি কারুকার্যময় বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল, তাতে ইংরেজীতে লেখা আছে, আমার ভীষণ প্রিয় বিড়ালটি আজ হঠাৎ হারিয়ে গেছে, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। গায়ের রং সাদা-কালো। বেশ বুদ্ধিমান ও খুবই মিশুক। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি খুঁজে পান, তবে অনুগ্রহপূর্বক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করলে, ভীষণ কৃতার্থ হবো।

বিজ্ঞাপন পড়ে, আমার মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেলো। নিচের খালি জায়গায় লিখলাম, নিশ্চয় ঠিকমত খাওয়া দেননি বা আদর-যত্ন করেননি? তবে পালাবে নাতো কি করবে? আমার ধারণা ছিল যে, অত্র এলাকায় কেবল বাঙ্গালী হিসেবে আমরাই থাকি, একজনও বাংলা জানা লোককে খুঁজে পাওয়া যাবে না, অতএব আমি কি লিখলাম না লিখলাম, কারও কিছু যায় আসে না।

বলাবাহুল্য, একেক দিন একেক পথে হাঁটি। বেশ কয়েক দিন ওপথে হাঁটিনি। একদিন কৌতুহল বশত: লাইট পোষ্ট লাগানো বিজ্ঞাপনটির কাছে গিয়ে আমিতো হতবাক হয়ে গেলাম। আমার লেখার নিচে, লাল কালিতে গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা-"প্রতিদিন নিয়মিত ঠিকমত খাইয়েছিতো, এমনকি স্নানও করিয়েছি, ভালোবেসেছি! তবুও কেন পালালো, বলুন তো?

লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে গেলো। ছুটে পালিয়ে এলাম, কেবলই মনে হচ্ছিলো, অলক্ষ্যে কেউ আমার প্রতিক্রিয়া হয়তো লক্ষ্য করছে। ভাষা ও নাম দেখে নিশ্চিত হলাম, পশ্চিম বাংলার কোন বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা হবেন। ভীষণ অপরাধবোধ হলো, আবার ফিরে গিয়ে ছোট করে লিখলাম।

-ম্যাডাম, আমি খুবই দুঃখিত, মজা করে লিখতে গিয়ে আপনাকে মনের অজান্তে কষ্ট দিয়ে ফেলেছি, আমাকে ক্ষমা করবেন। হারিয়ে যাওয়া বিড়ালটি খুঁজে পান এ প্রার্থনা করি। বিড়ালটি হারিয়ে মহিলা সত্যি মর্মাহত হয়েছিলেন।

আর এ পালানোর কথা মনে হতেই, স্বাধীনতার পরপরই যখন দেশে ফিরে আসি, তখন আমার কাকার একটি তীব্র ভৎর্সনা, আজও আমাকে তাড়া করে ফেরে। সে কথা ভেবে আমি দারুণভাবে মর্মাহত হই। সে বিষয়ে পরে আসছি।

২৬ ডিসেম্বর-১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে, অতি প্রত্যুষে ইষ্টনাম জপ করতে করতে বনগাঁ বর্ডার পার হয়ে, এক অনিশ্চিত পথে রওনা হয়ে পড়লাম। সদ্য স্বাধীন দেশ, নিজেকে সে দেশের নাগরিক ভাবতে গর্বে বুক ভরে গেলো। আমি যখন পায়ে হেঁটে-বাসে-চার চাক্কা রিক্সা-ভ্যানে চড়ে, খুলনা স্টিমার ঘাটে এসে পৌছলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শহরে ইলেকট্রিসিটি ছিলো না, নিঝুম অন্ধকার। দোকানগুলিতে কেরোসিনের প্রদীপ ও হারিকেনের আলো জ্বলছিলো। নিভু নিভু আলোতে একটি হোটেলে পেট ভরে ডাল ভাত খেলাম। আগেই খবর নিয়েছিলাম, একটি মাত্র দোতলা লঞ্চ, বরিশাল-চাঁদপুর হয়ে ঢাকা যাবে। স্টিমার লাইন তখনও পুরোপরি চালু হয়নি। লঞ্চটি ঘাটেই নোঙ্গর করা ছিলো। অনেকে কম্বল-চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। আমি রেলিং এর পাশে একটু জায়গা করে নিলাম। এক সময় ক্লান্তিতে ঢুলতে ঢুলতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গলো হৈ চৈ শব্দে বুঝলাম, আমরা বরিশাল পৌছে গেছি। প্রায় ঘন্টা দেড়েক পর লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশে আবার রওনা হল।

আমি যখন সদরঘাট লঞ্চ টারমিনালে এসে পৌছলাম। শীতের রাত ফলে অনেক আগেই সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তা-ঘাট কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। ব্যস্ততম রাস্তার দু-ধারে ফুটপাতের উপর নানা পণ্যের জমজমাট দোকানগুলো, আর আগের মতো নেই, সব শুনশান। হাঁটতে হাঁটতে সদরঘাট মোড়ে এসে দেখলাম, কতকগুলো ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, গুলিস্থান পর্যন্ত যাবে, চড়ে বসলাম। খট্‌খট্ ঘোড়ার খুরের শব্দে গাড়ি এগিয়ে চললো।

গুলিস্থান নেমে হেঁটেই রওনা হলাম কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনের উদ্দেশে। রেলস্টেশনের প্লাটফর্ম জুড়ে ছিন্নমূলেরা যে যার মতো শুয়ে আছে। কোন গাড়ি পেলাম না, অগত্যা একটি পিলারে হেলান দিয়ে বসে বসে ঘুমালাম, এর

আগেই ব্যাগে ছোট একটি পাউরুটি ছিলো, তা দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলাম।

খুব ভোরে মানুষের হৈ চৈ এর শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো, সবাই যে যার কাজে ছুটছে। একটি মালগাড়ি আগের দিন রাতে স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। খবর নিয়ে জানলাম এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাড়বে, চট্টগ্রামের উদ্দেশে। অনেকে গার্ডের সঙ্গে কথা বলে, কোথায় নামবে পয়সার বিনিময়ে চুক্তি করে নিচ্ছে। আমিও আড়িখোলা স্টেশনে নামার জন্য চুক্তিবদ্ধ হলাম, তবে ট্রেন স্টেশনে থামবে না, পূবাইল আর আড়িখোলার মাঝে একস্থানে ধীর গতিতে যাবে, তখন নামতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে এলে দু'বার জোড়ে হুইসাল দিয়ে ট্রেনটা কিছুটা ধীর গতিতে চলতে লাগলো, আমি দ্রুত নেমে পড়লাম।

বান্দাখোলা-কাচারিবাগ হয়ে, যখন রাঙ্গামাটিয়া মিশনে প্রবেশ করলাম, আনন্দ-বেদনার কেমন যেন এক মিশ্র অনুভূতি সৃষ্টি হলো। এতো পরিচিত স্থান, কেমন যেন অপরিচিত শ্রীহীন মনে হচ্ছে। পরিচিত কয়েকজন মুরুব্বীর সাথে দেখা হল-নমস্কার দিলাম, তারাও নমস্কার নিলেন ঠিকই, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তেমন কোন উৎসাহ নেই। বোধহয় আমার বেদিসা হাবভাব, উসকো-খুসকো চুল, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা, অপরিচ্ছন্ন পোষাক দেখে তারা তেমন গুরুত্ব দিলো না।

কস্তাদের গালা পার হয়ে, আমাদের বাড়ির উঁচু ভিটায় উঠে এলাম। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বংসস্তুপ। পরে জেনে ছিলাম, ঠাকুরদার আমলের বড় বড় টিনের ঘরগুলো, পাক সেনারা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে। সবাই আধ পোড়া টিন দিয়ে কোনমতে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছিলো। প্রথমেই ফিলিপ কাকার বাড়ি পড়লো-আমি তার অত্যন্ত স্নেহের ভাতিজা। কাকা উঠানে একটা পিড়িঁতে বসে হুক্কা টানছিলেন। আমাকে দেখে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে, অভিমানের সুরে বললেন–

আমাগো বিপদের মধ্যে ফেলাইয়্যা রাইখ্যা, পালাইয়া, গেছো গা? দেহ, বাড়ি-ঘর সব পোড়াইয়া-ছারখার কইর‍্যা দিছে,- খালি কোনমতে বাইচ্চা আছি, খাইয়্যা না খাইয়্যা।

আমি লজ্জায় কতক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম। ভেবেছিলাম আমাকে দেখে হয়ত কাকা আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরবেন, কিন্তু কিছুই হল না, এমনকি বসতেও বললো না।

বলা বাহুল্য, আমার কাকাও, বাড়ির অন্যান্যদের মতো সবর্স্ব হারিয়েছিলেন, তাই আমার প্রতি তার একটি চরম অভিমান, ক্রোধ ও তীব্র ঘৃণা থাকাটা খুবই স্বাভাবিক। সেদিনের পর থেকে আর কোনদিন তার সামনে সহজ হতে পারিনি। সব সময় এড়িয়ে চলেছি। আজ অবশ্য তিনি আর বেঁচে নেই, কিন্তু তার হৃদয় নিংড়ানো অভিমানের কথাটি-

-বাহে, আমাগো বিপদের মুখে থুইয়্যা তুমি পালাইয়া গেছো? আজ আবার কাকতালীয়ভাবে বিড়াল হারানোর বিজ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে, আমাকে সে ঘটনা সে মনে করিয়ে দিলো।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, আমি যখন দেশ ছাড়ি, তখন একমাত্র মা ছাড়া কাক-পক্ষীও টের পায়নি। এটাও কাকার অভিমানের প্রধান একটা কারণ। এখানে কাকার সম্বন্ধে কিছুটা বলা একান্ত প্রয়োজন।

আমার ফিলিপ কাকা, একজন খুবই সাধারণ মনের মানুষ ছিলেন। বাল্যকালে পড়ালেখা তেমন শেখেননি, কারণ প্রচুর পৈতৃক সম্পত্তি ছিল- গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, চাকর-বাকর নিয়ে বেশ অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবার। কাকা খুবই সুপুরুষ ছিলেন। ফর্সা গায়ের রং, সুঠাম লম্বা-চওড়া, শক্ত-সামর্থ দেহ, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। কাকার প্রধান বৈশিষ্ট হচ্ছে, তিনি খুব চড়া গলায়-সুন্দর গান গাইতে পারতেন এবং প্রচণ্ড জোরে শিষ দিতে পারতেন। বর্ষকালে দূর থেকে তার গান ভেসে আসতো। ছোটবেলায় তার কণ্ঠে শোনা একটি গান আজও মনে দাগ কেটে আছে। অত্যন্ত জনপ্রিয় গানটি হল-"আমার স্বপ্নে দেখা রাজ কন্যা থাকে।" গানটি কাকা নিজস্ব: ভঙ্গিতে, প্যারোডি করে গাইতেন–

"আমার স্বপ্ন দেখা রাজ কন্যা থাহে,
বড় খালের পাড়ে, আইন্যা দাও আমারে
বিয়া করুম তারে"

মা মুচকি মুচকি হাসতেন, দেওরের এ অভিনব বাসনার জন্য। মূলত: এ চড়া গলার জন্য গ্রামে যে কোন যাত্রা গানে তিনি বিবেকের গান গাইতেন। মাথায় পাগড়ি বেঁধে হেলে-দুলে মঞ্চকে দাপিয়ে দর্শক শ্রোতাদের মন মাতিয়ে তুলতেন।

কাকা আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন। আজও মনে আছে। গণ আন্দোলনের প্রাক্কালে ছুটিতে বাড়ি এলে, উঠান ভর্তি মানুষের কাছে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের নানা বৈষম্যের কথা তুলে ধরতাম। কেন আওয়ামী লীগকে ভোট দেওয়া উচিত, তার একটা লম্বা ফিরিস্তি তুলে ধরে তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতাম। আমাদের ভবিষ্যতের সুখ ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গড়ে তুলতে নানা সুখের স্বপ্ন দেখাতাম। বাড়ির ও গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতো। আমার কাকা পশ্চিমাদের নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপ শুনে, অতি সহজ মনে প্রায়ই প্রশ্ন করতেন-

-এতো কিছু হইতাছে, আমরাতো কিছুই জানি না বাহে। গ্রামে থাহি, তুমি না কইলেতো কিছুই বুঝতাম না।

বলা বাহুল্য, গ্রামে তখন কারও ঘরে টেলিভিশন তো দূরের কথা, একটা রেডিও ছিল না। যা-ও আমাদের পাশের বাড়িতে একটা রেডিও ছিলো, কিন্তু প্রায় সময়ই ব্যাটারি থাকতো না। মানুষ প্রতি রোববার রাত পৌনে দশটার ইংরেজী সংবাদের পর, বাংলা নাটক শুনতে বেশি আগ্রহী ছিলো। ফলে সংবাদ শোনার ব্যাপারে কারও কোন ইচ্ছা বা মাথাব্যথা ছিলো না। ফলে পাক বাহিনীর আচমকা আক্রমণে গ্রামের অনেকে সর্বস্ব হারিয়েছিলেন। সামান্যতম প্রস্তুত বা সতর্ক হওয়ার সুযোগ পায়নি। সে সময়ে কাকাকে যদি বলতাম, জাতির পিতার নির্দেশে, দেশ উদ্ধারের জন্য এক অনিশ্চিত জীবনের পথে, তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তিনি বাঁধা হয়ে দাঁড়াতেন।

মুক্তিযুদ্ধকালীন সে সময়ের ভয়াবহতা, নৃশংস হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার-নিপীড়ন, আজকের প্রজন্মের অনেকের কাছে হয়ত: রূপকথার গল্পের মতো মনে হতে পারে। বর্বর পাক-বাহিনীরা যে নির্মম তাণ্ডবলীলা চালিয়েছিলো '৭১ সনে এ দেশে, অসহায়-নিরীহ মানুষ জীবন বাঁচাতে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ছুটে গেছে নিরন্তর নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কত অসংখ্য গর্ভবতী মা, পথে ঘাটে, বাঙ্কারে বনে-জঙ্গলে কতনা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। সদ্যজাত শিশু সন্তান নিয়ে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে সন্তান ও নিজের জীবন বাঁচাতে অসহায়ের মতো ছুটে বেড়িয়েছেন। এ সকল মা, যারা যুদ্ধের সময় কষ্ট করে সন্তান জন্ম দিয়েছেন, নিজেদের সতীত্ব হারিয়েছেন, তাদের কথা আমরা কতোজন মনে রাখি।

আজ ভাবতে শিহরণ জাগে, ৩০ লাখ মানুষের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই "স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ।" '৭১ এ পাক সেনাবাহিনী যে নির্মম তাণ্ডব চালিয়েছিলো এ দেশে, তার জবাব দিয়েছিলো বাংলার সাধারণ মানুষ। উন্নত অস্ত্র বা সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না ঠিকই কিন্তু বুকে ছিলো অদম্য সাহস ও প্রবল মুক্তির আকাঙ্খা। ৯ মাস যুদ্ধ শেষে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঝরে গেছে লাখো মানুষের অমূল্য প্রাণ। তাদের আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। শহীদদের মধ্যে ছিলেন অনেক বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক এবং শিশু কিশোর, মা-বোনেরা। "মরণও সাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।"

আবার দীর্ঘদিন পর ২০০১ খ্রিস্টাব্দে যখন

সুখের সন্ধানে বিদেশে পাড়ি দিলাম। তখন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমনকি মা-ভাইবোনদেরও বলিনি, তাদের ঘোর অভিযোগ এটা আমার "পলায়ন"। কারণ তখন আমি সমাজ সেবার তুঙ্গে, সোনার চাকরি, নেতৃত্বে সুবর্ণ সুযোগ, সমাজে এতো প্রতিপত্তি ছেড়ে, কাউকে কিছু না বলে সব ছেড়ে-ছুড়ে পালিয়ে যাবো, কেউ সহজে তা মেনে নিতে পারেনি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, দেশে থাকতে কেউ কোনদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেনি; দাদা, আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা? কারণ এ ব্যাপারে কারও কোন উৎসাহ ছিলো না। তখন মুক্তিযোদ্ধা ভাতা চালু হয়নি। আমার অনেক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুরা খেতাবও পায়নি, ভাতাও পায়নি, এর আগেই মারা গেছে। যাদের সাথে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে "আগরতলা" গিয়েছিলাম। তারা প্রকৃত অর্থেই "বীর মুক্তিযোদ্ধা" ভাতা ও সম্মান দু'ইই যথারীতি পাচ্ছেন, আমি তাদের জন্য গর্বিত।

কিছুদিন আগে, আমার এক স্নেহের লেখকের একটি বইয়ের প্রকাশনী উৎসবে, আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম। উৎসবটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিলো-বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা। অনুষ্ঠান শেষে খাওয়া-দাওয়ার পর, বসে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম। দু'জন উদ্যোক্তা মদমত্ত অবস্থায় টলতে টলতে হেলে-দুলে এসে, আমার মুখের সামনে আঙ্গুল নাচিয়ে বললো–

-দাদা, একটা প্রশ্ন আছে? আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললাম-

-বল, বল কি প্রশ্ন?

-আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা?

হঠাৎ করে আমার মনে পড়লো, কিছুদিন আগে একজন ইউরোপ থেকে একই প্রশ্ন করেছিলো, আমি নাকি মুক্তিযোদ্ধা নই। কথাটা মনে পড়তেই, ওদের দিকে বিস্ময়ের সাথে তাকালাম। আমাকে আর অবকাশ না দিয়ে, পরপর আরও কয়েকটি প্রশ্ন করলো।

আপনি কি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা? সার্টিফিকেট আছে? ইত্যাদি আরও প্রশ্ন করতে চেয়েছিলো। আমি উঠে চলে এলাম, বলতে গেলে পালিয়ে এলাম।

অনুষ্ঠান শেষে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে, বিনা কারণে এতোবড় অপমানের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না, ব্যথা-বেদনায় দু-গণ্ড বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, আর ঠিক তখনই মনের গভীরে একটি গান গুণগুনিয়ে উঠলো।

এক নদী রক্ত পেরিয়ে, বাংলার আকাশে,
রক্তিম সূর্য আনলে যারা,
তোমাদের এ ঋণ কোনদিন শোধ হবে না।

হয়তো বা ইতিহাসে, তোমাদের নাম লেখা রবে না,
বড় বড় লোকেদের ভীড়ে, জ্ঞানী আর গুণীদের আসরে
তোমাদের কথা কেউ কবে না-
তুব হে বিজয়ী মুক্তি সেনা,
তোমাদের এ ঋণ কোনদিন শেষ হবে না।

মনে অনেক স্বস্তি পেলাম। স্বাধীনতার অর্ধ্ব শতাব্দীর পর এখন আবার নতুন করে "দেশপ্রেমের" পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, তাওবা তাদের কাছে, একাত্তরে যাদের বয়স ছিলো মাত্র ৭/৮ বছর। আমি কি করেছি, কি করতে পারিনি, কোথায় আমার ব্যর্থতা, তা বিস্তারিতভাবে ইতিপূর্বে বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং আমার বইতে লিপিবদ্ধ করেছি, আবার এখানে উল্লেখ করা "চর্বিত চর্বণ" হয়ে যাবে।

আমার বন্ধুরা আজও যারা দু'একজন বেঁচে আছে, বিভিন্ন কারণে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেনি। তারা আক্ষেপ করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ট্রেনিং নিয়ে ওরা (মুক্তিযোদ্ধারা) যখন দেশে ফেরে, তখন তাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, বাঙ্কার বানানো, খবরা-খবর আনা-নেয়া, একস্থান থেকে অন্যস্থানে নৌকায় নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পালন করেছি, কই? আমাদের কথা কেউতো ভুলেও মনে করে না, কোন সার্টিফিকেটও পেলাম না, ভাতা তো দূরের কথা।

দেশের জন্য যা কিছু করেছি, তা যতটুকু সামান্যই হোক না কেন, দেশকে ভালোবেসে নিঃস্বার্থভাবে করেছি, কোন কিছু পাওয়ার আশায় না। এসব যখন ভাবি তখন মনে পড়ে, আমেরিকার প্রয়াত অবিসংবাদিত নেতা-প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি তাঁর দেশের জনগণের উদ্দেশে এক অমূল্য বাণী দিয়েছিলেন–

And so, My fellow American's
ask not what your country can do for you? Ask what you can do for your country

অর্থাৎ-"আপনার দেশ, আপনার জন্য
কি করতে পারে তা জিজ্ঞেস করবেন না?
জিজ্ঞেস করুণ, আপনি আপনার দেশের
জন্য-কি করতে পারেন।"

বলা নিষ্প্রয়োজন, আমি মারা গেলে, এ উন্নত দেশে কেউ শ্রদ্ধা জানিয়ে গান স্যালুট দেবে না, এখানেই যত্ন সহকারে সমাহিত করবে। তবে কিসের ভয়?

বলা-বাহুল্য, বাস্তব বড়ই কঠিন। তবুও মানুষকে মেনে নিতে হয়। সহ্য করতে হয়, অনেক অন্যায়-অবিচার-মিথ্যাচার-অপমান। কতদিন আর বাঁচবো? ৭৫ বছর, ভাগ্য ভাল হলে, খুব বড় জোর ৮০ বছর। আমি খুব বেশি সময় নিয়ে তো এ পৃথিবীতে আসিনি। এই স্বল্প সময়ে, রাগ-হিংসা-বিদ্বেষ-অভিমান-ঘৃণার মতো ব্যাপারগুলোতে মন বেশি খারাপ করে, সময় নষ্ট না করে, আমি প্রচুর লেখি-বই পড়ি এবং সময় পেলে ভালো কোন জায়গায় ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি।

জননী-জন্মভূমির প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। স্বাধীনতার বদৌলতে-"বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্সের" মতো সংস্থায় চাকরি করার সুযোগ পেয়েছি, কতো দেশবিদেশ ঘোরার সুযোগ পেয়েছি। জীবনে কতো কিছু পেয়েছি, আবার না চাইতেও পেয়েছি প্রচুর। আমার মতো নগণ্য ব্যক্তির এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়া শুধু অন্যায় নয়, রীতিমতো পাপ। আমার প্রতি দেশের এ ভালোবাসার কথা মনে হতেই; কৃতজ্ঞতায় মন-প্রাণ ভরে উঠে, তখন অশ্রুসিক্ত নয়নে মনে মনে রজনী কান্তের গানটি গাই:-

আমি অকৃতি অধম, বলেও তো,
কিছু কম করে, মোরে দাওনি।
যা দিয়েছো তারি অযোগ্য ভাবিয়া,
কেড়েও তা কিছু নাওনি।

আমার দেশ, আমাদের গর্ব-অহংকার। যারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে, এ দেশকে স্বাধীন করেছেন, তাঁদের আমরা গভীরভাবে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করি। প্রতিটি বাঙ্গালীর হৃদয়ে রয়েছে, সর্বস্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র-শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসা। এদের অবদানের জন্য আমরা আজ গর্ব করে বলতে পারি, আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের দেশ নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আমাদের পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এ দেশ একদিন "সোনার বাংলাদেশ" হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবেই হবে। সদা সর্বদা আমাদের হৃদয়ের জানালা খুলে রাখতে হবে। কারণ ওরা আসবে আমাদের দেখতে তাই:-

"সব কটা জানালা খুলে দাও না,
আমি গাইবো বিজয়েরই গান,
ওরা আসবে চুপি চুপি,
যারা এই দেশটাকে,
ভালোবেসে দিয়ে গেছে প্রাণ।" ❑

লেখক: বাংলাদেশ বিমানের প্রাক্তন কর্মকর্তা
সমবায়ী ও সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব
আমেরিকা প্রবাসী

জোৎস্নায় ভরা নদী

ফ্লোরা লতা গমেজ

জীবন সুন্দর কিন্তু সহজ নয়। জীবন সুন্দর তখনই, যখন জীবন যুদ্ধকে জয় ক'রে ভাঙ্গাচুড়া পথে এগিয়ে যেতে যেতে সার্থকতায় পৌঁছানো যায়। প্রতিটি মানুষের জীবনে সুখ, দুঃখ, আনন্দ আর হাহাকারের কত বিচিত্র গল্প থেকেই যায়। তবে যে মানুষ সাফল্যের দেখা পান, তাদের বেলায় দীর্ঘ সময়ের কঠিন সাধনা আর শ্রম, ঘাম ঝরিয়ে সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছতে হয়। যে নারী কঠিন বাঁধাকে পিছনে ঠেলে বুদ্ধিমত্তা, আত্মবিশ্বাস ও পরিশ্রমের মধ্যদিয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যায়, সেই একদিন সফল হতে পারে। ঠিক তেমনই একজন আত্মবিশ্বাসী ও সফল নারীর জীবন সংগ্রামের গল্প বলবো।

মিসেস মিলি আক্তার "দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:" এর একজন সম্মানিত সদস্য। মিলি'র জন্ম বরিশাল জেলার বানারীপাড়া গ্রামে। শৈশব কেটেছে ছায়াঘেরা সবুজ এক গ্রামের বাড়িতে। ছোটবেলা থেকেই তিনি খুব

ডানপিটে আর চঞ্চল স্বভাবের ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই কোন কাজকেই ছোট করে দেখতে শেখেননি। বাবার সাথে কখনো দোকানে বসতেন, বাবাকে নানা রকম কাজে সাহায্য করতেন। রাতের বেলা বাবার সাথে বাড়ির উঠানে পূর্ণিমার চাঁদের জ্যোস্না মেখে খিল খিল ক'রে হেসে ম্যাটি মাখা গাঁয়ের প্রাণচঞ্চল বালিকা মিলি হঠাৎ এক মারাত্মক দূর্ঘটনার শিকার হ'য়ে ঘরে বন্দী হলো। তখন মিলির ৭ বছর বয়স। একদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে গোসল করার পর মায়ের স্নেহমাখা শাড়ি পরে বাইরে গেলে, খেলার ছলে বেলুন থেকে শাড়িতে আগুন লেগে শরীরের বেশিরভাগ অংশ আগুনে পুড়ে ঝল্‌সে যায়। সদরের হাসপাতালে নেয়ার পর ডাক্তার মিলিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পর, বাড়িতে পাঠিয়ে দেন আর বলেন যে, মিলি'কে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। বাড়ি ফিরে আসার পর মিলি'র পাশে পরিবারের একজন ক'রে থমথমে মুখে বসে থাকতো কারণ সবাই জানতো, মিলি যেকোনো সময়ই মারা যাবে। একটি পরিবারে একটি বালিকার মৃত্যুর জন্য সবার হৃদয়ছেড়া কষ্টের মধ্যদিয়ে অপেক্ষা। কি! নিদারুণ কষ্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে মিলি'র পরিবার। কিন্তু মিলি'র বাবার অদম্য ইচ্ছা ছিলো মিলি'কে বাঁচাতেই হবে আর মিলি তখনও মৃত্যু কি ঠিকমতো বুঝতো না জানতোও না। এককাত হ'য়ে শুয়ে এক চোখ বালিশে ভিতরে ঢাকা আর আরেক সাদা চোখ দিয়ে কাতরভাবে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকতো। বাবা আর বালিকা কন্যার চোখে চোখে কথা হতো। বাবা বুঝতো কন্যার বেঁচে ওঠার আকুল আকুতি, হু হু ক'রে কেঁদে উঠতো বাবার প্রাণটা। মিলি'র বাবার আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভালো থাকার কারণে মেয়েকে বাঁচানোর জন্য যে যা বলতো বাবা তাই করতো ।

একটি নদী যেমন তার পানির উৎস হারিয়ে গেলে শুকিয়ে যায় ঠিক তেমনি মিলি'র সমস্ত শরীর শুকিয়ে গেল, কলকল শব্দহীন, স্রোতহীন। শুধু খাঁ খাঁ রোদে পোড়া কাঠফাটা শুকনো নদী'র মাটির মতো হ'য়ে পরলো মিলি'র সারা শরীর। তখন মিলি'র বাবা মিলি'র জন্য ইন্ডিয়ান বার্ন ক্রিম, মাখন, ডাব আরো অনেক কিছু, যে যা বলতো তাই ব্যবহার করতো। পা সোজা করার জন্য তিলের তেল মাখানো হতো । কিন্তু ধীরে ধীরে মিলি সুস্থ না হ'য়ে তার শরীরে পঁচন ধরা শুরু করলো। তবুও হাল ছাড়েনি মিলি'র বাবা ও মিলি। যে মিলি একদিন তার ভবিষ্যতে জীবনে আশে পাশের কিছু মানুষকে নদীর মতো পলি মাটি ও দু'কুল ভ'রে নদীর পানি উজার ক'রে দিয়ে মানুষের উপকারে আসবে, পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে ও মিলি'র বাবার অন্তরের ইচ্ছাশক্তির জন্য কিছুদিনের মধ্যেই নতুন চারা গাছের মতো আবার মিলির নতুন জীবনের সূচনা হলো। মিলি ধীরে ধীরে সুস্থ হ'তে শুরু করলো। ছোট্ট মিলি মৃত্যু যন্ত্রণা ও কষ্ট জয় করে ফেললো। এরপর থেকে নিজেকে ভালো রাখার জন্য মিলি সাজুগুজু করতে পছন্দ করতো এবং সেই সময়কার দিনে সাদা কালো টেলিভিশন থেকে মেকআপ ও চুল বাঁধা শিখতো।

এরপর ঐ সময়ের সমাজের নিয়মে ৮ম শ্রেণি পাশ করার পরই ১৪ বছর বয়সে কিশোরী মিলি'কে পরিবার থেকে বিয়ে দেয়া হয়। বিয়ের পর এতো ছোট্ট বয়সে শশুরবাড়িতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য অন্যসকল কিশোরী বধূর মতো অনেক কষ্ট ক'রে সংসারের কাজ শিখতে হয়। শাশুড়ী ও ননদের আদরসহ বকা-ঝকা সহ্য করতে করতে দিন কাটতে থাকে। বিয়ের কিছুদিন পর স্বামীর ইচ্ছায় স্বামীর সাথে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় চলে আসেন মিলি। শুরু হয় মিলি'র নতুন জীবন। তখন মিলি বুঝতে পারে, ঢাকায় বসবাস করা এবং জীবন-যাত্রার ব্যয় মেটানো স্বামীর একার উপার্জনে খুবই কষ্ট ও হিসাব ক'রে চলতে হয় এবং মাস শেষে হাত খালির দুঃশ্চিন্তা চেপে ধরে। তাই মিলি, স্বামীর সাথে আলোচনা ক'রে তখন ঢাকার পি জি হাসপাতালে একজন নার্সের চাকুরি নেন। প্রতিদিন খুব সকালে শাড়ি প'রে হাসপাতালে যেতে হতো আর ফিরতে হতো সেই সন্ধ্যাবেলায়। স্বামীর সম্মতি সত্ত্বেও নার্সের চাকুরির জন্য মিলিকে তখন আত্মীয়স্বজনদের অনেক কটুকথার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। অবশেষে এইসব কটুকথায় অসহ্য হয়ে মিলি'কে হাসপাতালের নার্সের চাকুরিটা একদিন ছেড়েই দিতে হয়। কিন্তু বাস্তবতা! আত্মীয়-স্বজন কেউতো আর মিলি'র সংসারের খরচ যোগাবে না। এরই মধ্যে একদিন হঠাৎ ক'রে স্বামীর চাকুরিটাও চলে যায়। এই চরম সংকটের সময়ে কোনো আত্মীয়-স্বজন মিলি'র কাছে এসে আর্থিক বা মানসিক সহায়তার আশ্বাস দেয়নি। স্বামীর চাকুরি না থাকার কারণে পরিবারের আর্থিক সমস্যা আরও বেড়ে গেলো। পরবর্তীতে যেহেতু মিলির পার্লারের কাজের খুবই আগ্রহ ছিলো তাই নাবিস্কোতে একটা পার্লারে কাজ নেন। তখন প্রতিদিন মগবাজার থেকে মিলি'কে হেঁটে হেঁটে নাবিস্কোতে যেতে হতো। আবার ফিরতে ফিরতে রাত ১০ টা বাজতো। তারপর বাজার ক'রে রান্না ক'রে খেয়ে ঘুমাতে ঘুমাতে রাত ১ টা বাজতো। যখন মিলি ঘুমাতে যেতো তখন রাস্তায় ক্ষুধার্ত কুকরগুলি ঘেউ ঘেউ করতো, পাড়ার নাইট গার্ডের সতর্কীকরণের হুইসেলের আওয়াজ আর রাস্তার বড় বড় ল্যাম্পপোস্টের লাগানো তীব্র লাইটগুলোই যেনো মিলি'র দিকে তাকিয়ে দেখতো। ভীষণ কষ্টের সময় পার করতে হচ্ছিলো। মানুষের ভিড়ে মিলি, একা একা হেঁটে হেঁটে যাওয়া ও আসা এক মেয়ে, এইতো একজন নারীর সংগ্রামী জীবন। এরমধ্যে শত কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে মিলি'র কোল আলো করে সুখের ছোঁয়া নিয়ে আসে তার পুত্র সন্তান।

এমন অবস্থায় মিলি একদিন 'দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:' নামে মগবাজারে অবস্থিত একটি মহিলা সমিতি'র কথা শুনে ঐ সমিতি'র অফিসে আসেন এবং অফিসে এসে একজন সদস্য হন। মিলি যেদিন মর্নিং স্টার অফিসে আসেন ও সদস্য হন তখন এই অফিসের কর্মী ন্যান্সী আপার সাথে পরিচিত হন। অফিসের কর্মী ন্যান্সী আপার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হন। মিলি'র কাছে পুরো মর্নিং স্টার অফিসটাই একটি ফুলের বাগানের মতো মনে হলো। এই বাগানে সততার ফুল, নিষ্ঠার ফুল, শৃঙ্খলার ফুল, নারীর জাগরণের ফুল আর নারীর সরলতার ও নম্রতার ফুলে ফুলে ভরা একটি বাগান এই মর্নিং স্টার অফিস। মিলি বলেন, "একদিন ন্যান্সী আপু এই মর্নিং স্টার অফিসের বড় স্যার (সিইও স্যার) এর সাথে

আমাকে পরিচয় ক'রে দেন। সিইও স্যার আমার কথা শুনে আর আমার স্বপ্নের কথা শুনে আমাকে আমার শৈশবের সরলতা ও আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তুললেন এবং আমার দু'চোখে আগামী দিনের স্বপ্ন ভ'রে দিলেন। সিইও স্যারের সাথে কথা বলার সময় আমার ছোট্ট বেলায় বাবার হাত শক্ত ক'রে ধ'রে বাঁশের সাঁকো পার হতাম আর শীতের দিনে মায়ের বানানো ছোট্ট একটি পিঠা হাতে শিশির ভেজা পিচ্ছিল ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে হাঁটতাম তখন ঐ যে বাবার হাতটা শক্ত ক'রে ধরতাম ঐ স্মৃতিটা খুব মনে পরছিল।"

আমি ভালোবেসে ফেললাম এই দি মর্নিং স্টার কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি: মহিলা সমিতি'কে। এই মর্নিং স্টার একটি মহিলা সমিতি এবং নারী কর্মীরাই বেশি। মিলি, স্বামীর পুরো সমর্থন ও সহযোগিতায় সাহস ক'রে পার্লারের কাজ ভালোভাবে শেখার জন্য ১০ হাজার টাকা দিয়ে কোর্স করলেন। তারপর তিনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিভিন্ন পার্লারে দক্ষতার সাথে কাজ ক'রে ও শিখে পার্লারের কাজ দক্ষভাবে রপ্ত করে ফেলেন। যখন মিলি বুঝতে পারলেন, এবার নিজের একটা পার্লার দেয়ার যোগ্যতা তার আছে, তখন সাহস ক'রে ঠিক করলেন এবং ছোট ক'রে একটা পার্লার দিবেন। তখন নিজের শখের গহনা বিক্রি ক'রে এবং অনেক দিনের সঞ্চয় করা তার আদরের মাটির ব্যাংক ভেঙ্গে নিজের ও স্বামীর জমানো টাকা দিয়ে বনশ্রীতে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে একটা পার্লার শুরু করলেন। প্রতিদিন মগবাজার থেকে গিয়ে সেখানে কাজ করতেন। প্রথমে নিজে একাই পার্লারের সব ধরণের কাজ করতেন। পরবর্তীতে মগবাজার থেকে বনশ্রী একটু দূর হওয়ায় এবং কিছু অনভিপ্রেত সমস্যার কারণে সেখান থেকে পার্লারটি বন্ধ ক'রে মগবাজারে স্থানান্তরিত ক'রে নতুন ভাবে করেন। পার্লার এর নাম দিলেন **'ওমেনস্ থিংকস্ বিউটি পার্লার'**। এবার ধীরে ধীরে মিলি'র ভাগ্যের চাকা খুলতে লাগলো। পার্লার ভালোই চলছিলো। মিলি'র অমায়িক ব্যবহার, মিষ্টি হাসি ও ইতিবাচক কথা ও ব্যবহার এবং এর সাথে মিলি'র দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের ফলে সফলতার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানোর মত কিছু ছিলো না। মিলি অভিজ্ঞতা, সাহস আর পরিশ্রম নিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। মিলি বুঝতে পেরেছিলেন যত পরিশ্রম করা যায় তত অর্থ আয় করা যায়। দিনরাত পুরো সময় মিলি তার পার্লারের ব্যবসা কিভাবে আরও ভালো করতে পারবে, পাশাপাশি স্বামীর বাড়িতে ময়মনসিংহের ফুলবাড়ি গ্রামে পুকুরে মাছের চাষ ও মুরগীর ফার্ম দেয়ার কাজে নিজেকে যুক্ত করেছেন। একদিকে নিজের পরিশ্রম দিয়ে সাফল্য বের ক'রে আনা ও স্বামীর ভালোবাসায় ভরা সমর্থন নিয়ে মিলি তিনটি ব্যবসা ক'রে এগিয়ে যাচ্ছেন।

এরপর শুরু হল ২০২০ খ্রিস্টাব্দে করোনার থাবা। সে সময় সবার মতো মিলি'র পার্লারের অবস্থা খুব খারাপ হ'য়ে পড়লো এবং আয় রোজগার বন্ধ হ'য়ে গেল। তখন মিলির পার্লারে ৭ জন বিউটিশিয়ান কাজ করতো। সে সময় একটানা ২ মাস পার্লারটি বন্ধ ছিল। তবুও মিলি তার পার্লারের বিউটিশিয়ানদের কাজ থেকে বাদ দেননি এবং যতটুকু পারতেন প্রত্যেক মাসে ঐ সাতজন বিউটিশিয়ানদের বেতন দিতেন। তাই সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদে মিলি'র ব্যবসা আবার ঘুরে দাঁড়ালো। সঠিক পরিকল্পনা আর পরিশ্রম ক'রে আবার সফলতার দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়ালো এবং বর্তমানে মিলি পাঁচজন বিউটিশিয়ানদের নিয়ে খুব পরিপাটি ও নান্দনিক ভাবে সাজানো এই পার্লারটি পরিচালনা করছেন।

পাশাপাশি মাছের চাষ দেখাশুনা করার জন্য দুইজন ও মুরগীর ফার্ম দেখাশুনার জন্য দুইজন মোট নয়জন মানুষের কর্মসংস্থান করতে পেরেছেন। মিলি'র ব্যবহার খুবই অমায়িক কিন্তু শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন না থাকলেও, আত্মবিশ্বাসে আর পরিশ্রমে মানুষ এতদূর এগিয়ে যেতে পারে, তার প্রমাণ হ'চ্ছে মিলি। একজন দক্ষ বিউটিশিয়ান হিসেবে দুবাই, ইন্ডিয়াতে প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য কয়েক বার গিয়েছেন এবং সাফল্যের সাথে ঐসব প্রশিক্ষণ শেষ ক'রে পেয়েছেন অনেক সম্মান। উক্ত প্রশিক্ষণ শেষ করার পর নিজেও এখন দুবাই গিয়ে পার্লারের কাজের উপর বিভিন্ন দেশের মেয়েদের সাথে পার্লারের কাজের উপর প্রশিক্ষণ নেন। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের মেয়েদের সাথে পার্লারের বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন এবং নিজেকে আরও দক্ষ বিউটিশিয়ান হিসেবে গ'ড়ে তুলছেন। এরসাথে মিলি গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে কনের গহনাসহ পুঁতির গহনা ও মেটালের গহনা বানান এবং পার্লারের ব্যবসার সাথে বিক্রিও করেন। মাঝে মাঝে বিশেষ ক'রে ঈদের সময় টানা চার পাঁচ দিন রাত-দিন কাজ করতে হয়। আবার কিছু কাস্টমার আছেন যারা বর্তমানে আমেরিকা, কানাডা থাকেন, কিন্তু চুলের কাজ ঢাকায় এসে মিলি'র হাতেই করবেন। মিলি ব'লেন আমি আসলে সত্যিকারের কাজটিই ক'রে দিই এবং আমার কাছে মাঝে মাঝে মান সম্পন্ন উপকরণ না থাকলে আমি কখনওই নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করি না। কাষ্টমারকে বলি যে, ঐ মানসম্পন্ন উপকরণ আমি যোগার ক'রে তারপর আপনার সাজানো বা চুলের কাজ ক'রে দিবো। যার জন্য ভালো ভালো কাষ্টমার আমাকে কখনওই ছেড়ে যায় না। আমি সারা জীবন ন্যায়ের সাথে সত্যের সাথে কাজ ক'রে যেতে চাই।

একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে মিলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত শিক্ষকদের সাথে ব'সে সহজ সরল ভাষায় একই মঞ্চে বক্তৃতা দেন। কতো শিক্ষিত মানুষ মিলি'র সহজ সরল ভাষায় তার অভিজ্ঞতায় ভরপুর আত্মোপলব্ধিমূলক কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে উঠেন।

মিলি বলেন, "মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্ট থাকবেই কিন্তু এগুলো ধরে বসে থাকা যাবে না এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন থাকতেই হবে। আমার এই সফলতার পিছনে মর্নিং স্টার মহিলা সমিতি'র অবদান অপরিসীম। মর্নিং স্টার মহিলা সমিতি আমাকে ব্যবসায়িক সাফল্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আরও মসৃণ ও সুদূরপ্রসারী করেছে। আমার নিজের প্রচেষ্টায় ও শ্রমে সফল ব্যবসায়ী হলেও মর্নিং স্টার আমার পাশে থেকেছে সবসময়। আমার সৌভাগ্য এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে। আমার ব্যবসার প্রয়োজনে অনেকবার ঋণ নিয়েছি এই প্রতিষ্ঠান থেকে। নিয়মিত ফেরতও দিয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনেক সম্মানও পেয়েছি। এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আরও নারী উদ্যোক্তা তৈরি হোক এই কামনা করছি।"

আজও মিলি সারাদিন নিজের ব্যবসার নানা কাজের মধ্যদিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। বর্তমানে মিলির স্বামী একটি পত্রিকা অফিসে সাংবাদিকের কাজ করেন এবং ছেলে দশম শ্রেণিতে পড়াশুনা করছে। তাই মিলি এখন স্বামী, সন্তান নিয়ে পরিবার দেখাশুনা করার পরও নয়জন মানুষের মধ্যদিয়ে নয়টি পরিবারের ভাত-কাপড়ের সংস্থান করতে পেরেছেন। নিজেকে নিয়ে এখনও কত স্বপ্ন দেখেন এবং সারাদিনের পর যখন রাতে ঘুমাতে যান মিলি, তখন ঐ প্রথম জীবনে ঢাকায় আসার পর পিজি হাসপাতালে নার্সের চাকুরি, নাবিস্কোতে পার্লারের চাকুরি করা এরপর বাজার করা, রান্না করা এবং গভীর রাতে ঘুমুতে যাওয়ার সময় রাস্তার ক্ষুধার্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ, নাইটগার্ডের হুইসেলের শব্দ ও রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের লাইটের তীব্র আলোর কথা মনে পরে এবং যখন ধীরে ধীরে মিলি'র চোখে ঘুম নেমে আসে তখন মিলি'র ভাবনায় সেই বালিকা বেলার বাবার হাত ধ'রে সন্ধ্যাবেলা সারা গায়ে চাঁদের জোৎস্না মেখে বাড়ির উঠোনে খিল খিল ক'রে হেসে উঠা, ক্ষেতের ফসল ফলানোর জন্য প্রখর রোদে ও অঝোর বৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে কৃষকদের সাথে বাবাকে একটানা উবু হ'য়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করার স্মৃতি এবং বাড়ির সামনেই জ্যোৎস্নায় দু'কুল ভরা নদীটির কথা মনে করতে করতে বিছানার কোমল পরশে মিলি অঘোরে ঘুমিয়ে পরেন।

আবার শুরু হবে নতুন একটি দিন, স্বপ্নের দিন...॥ ❑

লেখক: আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী